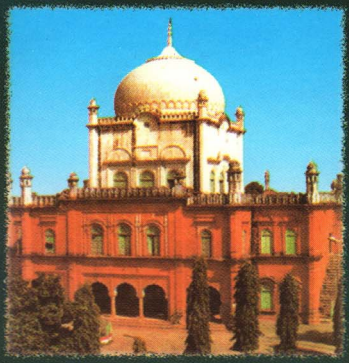

ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত
প্রভৃতি অমুসলিম রাষ্ট্রের সফরনামা

অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক

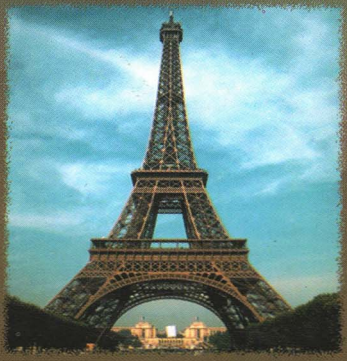

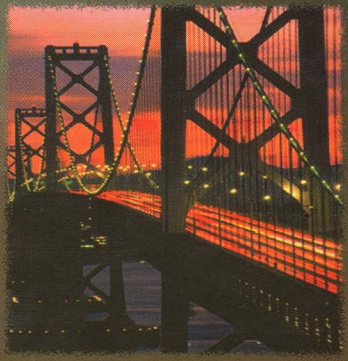

জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক

[জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম)–এর আমেরিকা, ব্রিটেন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ও ফ্রান্সের ঐতিহাসিক সফরনামা]

মূল

জাস্টিস মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(দামাত বারাকাতুহুম)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

মুদাররিস ঃ টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা

ইমাম ও খতীব ঃ আলবাইতুল মা'মুর জামে মসজিদ

আহালিয়া, উত্তরা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক

মূল ঃ জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ০১১–৮৩৭৩০৮, ০১৭–১৪১৭৬৪

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
মুহাররম ১৪২৪ হিজরী
মার্চ ২০০৩ ঈসায়ী

প্রথম প্রকাশ ঃ
সফর ১৪২৩ হিজরী
মে ২০০২ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতাজ
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা–১১০০, ফোন ঃ ৭৩৯৫২৭৪
ISBN-984-8291-06-7

মূল্য ঃ নব্বই টাকা মাত্র

OMUSLIM DESHE MUSLIM PARJATAK
By : Justice Maulana Muhammad Taqi Usmani
Translated by : Maulana Muhammad Jalaluddin
Price Tk. 90. U.S. $ 5.00 only

উৎসর্গ

আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের উদ্দেশ্যে। যাঁরা পেটে পাথর বেঁধে
সকল প্রকার তাগুত ও বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন,
নিজেদের রক্ত ও ঘাম ঝরিয়ে উপমহাদেশে মুসলমানদের
ইজ্জত ও আযাদীর প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। যাঁরা ছিলেন
এ শতাব্দীর দ্বীনের শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁদের
সত্যিকারের উত্তরসূরী হওয়ার
তাওফীক দান করুন।
আমীন।

—অনুবাদক

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেবের
ঐতিহাসিক সফরনামা **'জাহানে দিদাহ'**–এর অনুবাদ

'ফুরাত নদীর তীরে' (প্রথম খণ্ড)
যাতে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর ও
আলজিরিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

'উহুদ থেকে কাসিয়ূন' (দ্বিতীয় খণ্ড)
যাতে সৌদী আরব, জর্দান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সফরনামা
বিবৃত হয়েছে।

'হারানো ঐতিহ্যের দেশে' (তৃতীয় খণ্ড)
এটি তুর্কিস্তান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ,
কাতার ও চীনের সফরনামা।

'অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক' (চতুর্থ ও সর্বশেষ খণ্ড)
এ অংশে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি অমুসলিম
রাষ্ট্রের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

অনুবাদকের কথা

اللهم لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك - و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على اله واصحابه اجمعين إلى يوم الدين -

আল–হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ কারীমের অপার অনুগ্রহে 'অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক' প্রকাশিত হওয়ার কালে আমি আপাদমস্তক দ্বারা একান্তভাবে তাঁরই শুকর গুজারী করছি।

এটি মূলতঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (মুঃ যিঃ আঃ)এর বিশাল ভ্রমণ কাহিনী 'জাহানে দীদাহ'–এর বাংলা তরজমার চতুর্থাংশ, যা এ কিতাবের শেষাংশও বটে।

বিদগ্ধ লেখক তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনীতে বিশটিরও অধিক দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে তিনি এসব দেশের সঙ্গে জড়িত ইতিহাসের কপোলে জ্বলজ্বলকারী অমূল্য রত্নাবলী আহরণ করে বইটিকে বিচিত্র রত্নসমাহারে সমৃদ্ধ করেছেন। উপরন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন।

আমি আসলে 'জাহানে দীদাহ'–এর বিষয় বৈচিত্র, জ্ঞান সম্ভার এবং লেখকের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দুর্বলতা হেতু বইটির তরজমার কাজে হাত দেই। আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল তরজমার অঙ্গনে অল্প অল্প পদচারণা করে অনুশীলনের কাজকে চালু রাখা। বাংলায় এর তরজমা প্রকাশ করা আমার কল্পনারও ঊর্ধ্বে ছিল। কারণ আমার কলম সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল হয়ত অন্যরকম। তিনি পথ সুগম করে দিলেন। কাজকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করালেন এবং এর জাহেরী আসবাবও জোগাড় করে দিলেন। অর্থাৎ, 'মাকতাবাতুল আশরাফ'–এর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাবর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব বই–এর তরজমাকৃত অংশ দেখলেন এবং তা শেষ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাড়া দিলেন এবং বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন। আমি

আমার দুর্বলতার কথা তাঁকে অকপটে জানালাম। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। পাণ্ডুলিপি নিয়ে নিলেন এবং দায়িত্ব সচেতন আন্তরিকতার সাথে সংশোধন করে বই আকারে প্রকাশ করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ সেই বই আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এতে ভুল–ত্রুটি ও অসঙ্গতি যা আছে তা সব অনুবাদকের আর সুন্দর ও ভাল যা কিছু আছে, তা বুযুর্গ লেখক ও মাওলানার কৃতিত্ব।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্যক্তি ও জায়গার নাম যেগুলো উর্দু থেকে বাংলা করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলো নাম ভিনদেশী ও অজানা থাকার কারণে সঠিকভাবে আদায় করা হয়ত সম্ভব হয়নি। তাই বিশেষভাবে এর ভুল–ত্রুটিগুলো আমাদের গোচরীভূত করার এবং ক্ষমার চোখে দেখার অনুরোধ রইল।

আমার এই কাজ এ পর্যন্ত পৌঁছতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁদের সহযোগিতা ও দু'আ রয়েছে, তাঁদের সকলের নিকট বিশেষ করে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব ও স্নেহের তৈয়ব–এর নিকট আমি চির ঋণী।

আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ইহ–পরকালে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং আমাদের এই মেহনতকে সার্বিকভাবে কবুল করুন। আমীন।

দু'আপ্রার্থী
মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
বেজগাতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد

আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগের কথা। পাকিস্তানের বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'তাকবীর'–এর ভেতরের পৃষ্ঠায় ছোট একটি বিজ্ঞাপন আমার দৃষ্টিগোচর হয়। বিজ্ঞাপনটি ছিল জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন জাষ্টিস মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর বিশটি দেশের ঐতিহাসিক সফরনামা 'জাহানে দিদাহ' কিতাবের।

আমি এমনিতেই পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেবের লেখার প্রতি মারাত্মক রকমের দুর্বল। এরপর আবার এ কিতাবটি তাঁর সফরনামা।

সুতরাং বিজ্ঞাপনটি দেখেই কিতাবটি সংগ্রহ করি এবং এর বেশ কিছু অংশ সেদিনই পাঠ করি। মূলতঃ কিতাব পাঠের যে অপূর্ব স্বাদ ও আত্মতৃপ্তির কথা আসাতেযায়ে কেরামের মুখ থেকে শুনেছি, তার সামান্য ছিটে–ফোটা আমি এ কিতাবেই অনুভব করি। সাথে সাথে মনের মনিকোঠায় এর বঙ্গানুবাদের দুর্বল ইচ্ছেও হতে থাকে। কিন্তু এর অতি উন্নত রচনাশৈলী উচ্চাঙ্গের ভাষার ব্যবহার আমার সে ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দেয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন এত বৃহৎ কিতাব অনুবাদের কাজে হাত দেয়ার সাহস ও অবকাশ কোনটিই হয়নি।

গত প্রায় ছ' মাস পূর্বে একটি ঘরোয়া দ্বীনী মাহফিলে পরিচয় হলো, নবীন কর্মঠ আলেম বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন সাহেবের সাথে। তিনি সে মাহফিলে একটি উর্দূ কিতাব থেকে পাঠ করে তা বাংলায় অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। তার মূলানুগ অনুবাদ, উপযুক্ত ও উন্নত ভাষার ব্যবহার আমাকে

বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আমি তাকে প্রয়োজনীয় আরবী–উর্দূ কিতাব থেকে বঙ্গানুবাদ করার প্রস্তাব রাখি। তিনি বললেন, "আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর ঐতিহাসিক সফরনামা 'জাহানে দিদাহ'–এর কিছু নির্বাচিত অংশ অনুবাদ করেছি।" সাথে সাথে সেগুলো সম্পাদনার অনুরোধও তিনি আমাকে করলেন। আমি তার সে সকল অনুবাদ খুবই আগ্রহের সাথে দেখলাম। তিনি রচনা ও অনুবাদের জগতে নবীন হলেও সামান্য কিছু অসঙ্গতি ছাড়া তার রচনা ও অনুবাদ অনেক প্রবীণের চেয়েও উন্নত। অতএব আমি তাকে পূর্ণ 'জাহানে দিদাহ' অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমার প্রতি সুধারণা বশতঃ উল্টো অনুরোধ করে বসলেন, আপনি সম্পাদনা করলে আমি অনুবাদ করতে প্রস্তুত আছি।

আমাদের বর্তমান আয়োজন 'অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক' হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর ঐতিহাসিক সফরনামা 'জাহানে দিদাহ'–এর ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত অংশের বঙ্গানুবাদ। এটি কিতাবের শেষাংশও বটে।

পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আমরা অনুবাদকে চার ভাগে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ করছি। এদিক দিয়ে প্রতিটি অনুবাদই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রন্থ। 'ফুরাত নদীর তীরে' এর প্রথম অংশ যাতে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর ও আলজিরিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত। 'উহুদ থেকে কাসিয়ূন' দ্বিতীয় অংশ, যাতে সৌদী আরব, জর্দান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সফরনামা বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অংশ, 'হারানো ঐতিহ্যের দেশে', এটি তুকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, কাতার ও চীনের সফরনামা। বক্ষমান গ্রন্থ 'অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক' চতুর্থ অংশ, এ অংশে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত প্রভৃতি অমুসলিম রাষ্ট্রের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

আমি আমার সাধ্যমত সম্পাদনার চেষ্টা করেছি, তারপরও যদি কোন ভুল–ত্রুটি থেকে যায়, কিংবা কোন অসঙ্গতি কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাদের অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের প্রবল আশা যে, ঐতিহাসিক এ সফরনামা পাঠক মাত্রের অন্তরকেই নাড়া দিবে, উৎসাহিত করবে আমাদের সেই পূর্ব পুরুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মেহনত ও মুজাহাদার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে শিরক কুফর ও বিদআতের ঘনান্ধকার দূরীভূত করে পৃথিবীকে আবার একটি সোনালী যুগ উপহার দেওয়ার।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

নিবেদক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

সূচীপত্র

অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমেরিকা ও ইউরোপের প্রথম সফর	১৭
আমেরিকার মুসলমান	১৮
আমেরিকায় ইসলাম	২০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত	২২
প্রতিক্রিয়া	২৬
পাশ্চাত্যের জীবনধারার আলোকময় দিক	২৬
পাশ্চাত্য জীবনধারার অন্ধকার দিক	২৯
মানবতার আর্তনাদ	৩২
নারী স্বাধীনতা , না নারী নির্যাতন?	৩২
একটি ভুল ধারণার অবসান	৩৭
ভারত সফর	
দারুল উলূম দেওবন্দের শতবার্ষিকী মাহফিল	৪১
দারুল উলূমের মাটি	৪৫
মাকবারায়ে কাসেমী	৪৬
মাহফিলের চিত্র	৪৯
শতবার্ষিকী মাহফিলের শিক্ষা	৫৬
দারুল উলূম কি ও কেন	৫৭
আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫৮
জামে মসজিদের বয়ান	৫৯
সাইয়েদ আসগর হুসাইন সাহেবের কুটিরে	৬১
স্বর্ণমানব প্রসবা নানুতা	৬২
মা'রেফাতের কেন্দ্র থানাভনে	৬৬
রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ)এর মাযারে	৭৪
মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরে	৭৯
দিল্লীর সফর	৭৯
শাহ অসীউল্লাহ সাহেবের খানকায়	৮০
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাত	৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায়	৮৪
সার্বিক প্রতিক্রিয়া	৮৭
দক্ষিণ আফ্রিকার দুই সফর	
প্রথম সফর	৯৩
দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী	৯৪
দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা	৯৪
দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য	১০২
কৃতজ্ঞতা	১০৫
দ্বিতীয় সফর	১০৬
মোকদ্দমার বিবরণ	১০৯
আদালত ও এজলাসের চিত্র	১১২
মুসলমানদের পক্ষের উকিলের বক্তব্য	১১৫
আদালতের রায়	১১৮
আশার চূঁড়া	১১৯
দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের অবিস্মরণীয় কুরবানী	১২০
মুসলমানদের উপর কৃষ্ণাঙ্গদের আক্রমন, কারণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায়	১২৫
প্রত্যাবর্তন	১২৮
কানাডা, আমেরিকা, ফ্রান্স সফর	
কানাডা	১৩১
ওয়াটার লো শহরে	১৩৪
টরেন্টো নগরীতে	১৩৬
নায়াগ্রা জলপ্রপাত	১৩৯
সাইন্স সেন্টার	১৪৩
মন্টারিয়াল নগরীতে	১৪৫
মেকেগাল বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৬
মা'হাদ আর রশীদ আল ইসলামী	১৫৩
অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম	১৫৬
শিকাগো নগরীতে	১৬০
প্যারিসে শেষ দিন	১৬৫
সার্বিক প্রতিক্রিয়া	১৬৭

আমেরিকা ও ইউরোপের প্রথম সফর

সফরকাল ঃ শাবান ১৩৯৮ হিজরী
মোতাবেক জুলাই ১৯৭৮ ঈসায়ী

فرنگ میں کوئی دِن اور بھی ٹھہر جاؤں
مرے جُنوں کو سنبھالے اگر یہ ویرانہ

পাশ্চাত্যের দেশসমূহে কিছুদিন থেকে যাও যদি তুমি
হয়তো হৃদয়ের উন্মাদনা দূর করবে এই বিরানভূমি !

আমেরিকা ও ইউরোপের প্রথম সফর

আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের অনেকগুলো সংগঠন রয়েছে। সেসব সংগঠনের অন্যতম 'ফেডারেশন অব ইসলামিক এসোসিয়েশন' (F.I.A)। এটি আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুসলমানদের ছোট ছোট সংগঠনের একটি জোট। এর প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কে। এফ.আই.এ. প্রতি বছর আমেরিকার কোন এক অঞ্চলে তাদের বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত করে থাকে। এ বৎসর এর বার্ষিক কনভেনশন আমেরিকার ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার প্রধান শহর চার্লষ্টনে অনুষ্ঠিত হয়। চার্লষ্টন ওয়াশিংটন থেকে প্রায় তিনশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এবার কনভেনশনে সংগঠনের সদস্যদের ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী দেশের প্রতিনিধিকেও অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। এই সূত্রে পাকিস্তান সরকারকেও প্রতিনিধি প্রেরণের দাওয়াত করা হয়। পাকিস্তান সরকার ঐ কনভেনশনে অংশগ্রহণের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে। তার মধ্যে মুহতারাম জনাব খালিদ ইসহাক সাহেব (এ্যাডঃ), জনাব ডঃ তানযীলুর রহমান সাহেব এবং আমার (মুহাম্মাদ তাকী উসমানী) নাম প্রস্তাব করা হয়।

আমরা একেবারে হঠাৎই আমাদের যাত্রার তারিখ সম্পর্কে জানতে তারিখ। ২০শে জুলাই চার্লষ্টনে কনভেনশন শুরু হবে আর ১৪ই জুলাই আমাদের নিকট থেকে এই ব্যাপারে মঞ্জুরী নেওয়া হয়। ২০শে জুলাই চার্লষ্টন পৌছার অর্থ কমপক্ষে ১৮ই জুলাই আমাদেরকে যাত্রা করতে হবে। তাই সফরের প্রস্তুতির জন্য মোট তিনদিন সময় আমরা হাতে পাই। যার একদিন প্রবল বৃষ্টির কারণে হাতছাড়া হয়ে যায়। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি যে, পাকিস্তান সরকারের নিকট এফ.আই.এ এর পক্ষ থেকে দাওয়াতই পৌছে অনেক দেরীতে। যে কারণে সফরের প্রস্তুতি অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হয়।

১৮ই জুলাই রাত দুটায় পি.আই.এ.-এর বিমানযোগে আমরা নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এটি ছিল ২৬ ঘন্টার অতি দীর্ঘ এক

সফর। তিন মহাদেশ অতিক্রম করে বিমান আমেরিকায় পৌছবে। মাঝে দুবাই, কায়রো, ফ্রাঙ্কফোর্ট ও প্যারিসে যাত্রাবিরতি করতে হবে। করাচী থেকে যাত্রা করার পর সে দিন আমরা রাত্রি পাই শুধুমাত্র তিন ঘন্টা। তারপর প্রায় তেইশ ঘন্টা অবিরাম দিন চলতে থাকে। কারণ সূর্যের সাথে সাথে বিমানও চলছিল। করাচীর সময়ানুপাতে ১৮ই জুলাই রাত ৯টায় বিমান যখন প্যারিসে পৌছায়, তখন সেখানে বিকাল পাঁচটা। বিমান বন্দরেই আমরা আসরের নামায আদায় করি। তারপর বিমান একাধারে ছয়ঘন্টা আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়তে থাকে। এ পুরো সময়টাতেই আসর নামাযের সময় রয়ে যায়। সপ্তম ঘন্টায় যখন বিমান নিউইয়র্ক পৌছে তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। করাচীতে তখন ১৯শে জুলাইয়ের ভোর পাঁচটা, আর এখানে ১৮ই জুলাই এর সন্ধ্যা ৭টা। এখানে ৮টার পরে সূর্য অস্ত যায়, তাই আসরের সময় তখনও অনেক বাকী ছিল।

আমাদেরকে নেওয়ার জন্য নিউইয়র্কে নিয়োজিত পাকিস্তানের উপ–কাউন্সিলর বিমান বন্দর এসেছিলেন। ফলে বিমান বন্দরের সকল ঝামেলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ! সে রাত্রে আমরা নিউইয়র্কের একটি হোটেলে অবস্থান করি। পরের দিন এগারোটায় নিউইয়র্ক থেকে আমরা চার্লষ্টন অভিমুখে যাত্রা করি। দুপুর একটার কাছাকাছি সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌছে যাই। চার্লষ্টন ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার রাজধানী। সবুজ শ্যামল পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত কিনুহা নদীর তীরের হোটেল হলিডে ইন–এ আমরা অবস্থান করি। এই হোটেলেরই একটি হলকক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

আমেরিকার মুসলমান

আমেরিকায় চার প্রকারের মুসলমান রয়েছে। প্রথম, সেসব মুসলমান, যারা মূলত অন্য কোন মুসলিম দেশের বাসিন্দা, কিন্তু চাকুরী, ব্যবসা বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় বাস করছে। দ্বিতীয়, সেসব মুসলমান, যাদের পিতা ও পিতামহ অন্য কোন মুসলিম দেশের বাসিন্দা ছিল এবং যে কোন কারণে দেশ ত্যাগ করে এখানে এসে বসবাস শুরু

করেছে। বর্তমানে তাদের বংশধরগণ আমেরিকাতেই বেড়ে উঠেছে। তাদের জীবন–যাপন পদ্ধতিতে তাদেরকে ১০০ ভাগ আমেরিকান মনে হলেও আকীদার দিক থেকে তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করে। তৃতীয়, কৃষ্ণাঙ্গ নওমুসলিম, যাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক এলিজার অনুসারী, যে মূলত মুসলমান নয়। আর কিছু আছে প্রকৃত মুসলমান, তারা বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের তালীম ও তাবলীগের উসীলায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিংবা শুরুতে তারা এলিজার অনুসারী ছিল, পরে তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ায় সঠিক অর্থেই ইসলাম কবুল করেছে। এই শ্রেণীর কৃষ্ণাঙ্গ নওমুসলিমদেরকে সাধারণত বেলালী মুসলমান বলা হয়। চতুর্থ, শ্বেতাঙ্গ নওমুসলিম। এরা আমেরিকান বংশের সেসব লোক, যারা বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের তালীম ও তাবলীগের দ্বারা মুসলমান হয়েছে।

এফ.আই.এ (যার ব্যবস্থাপনায় এই কনভেনশন হচ্ছিল) যদিও সাংবিধানিকভাবে উপরোক্ত চার প্রকারের মুসলমানেরই সংগঠন, কিন্তু কার্যত তাতে প্রথম দুই প্রকারের মুসলমান বেশি এবং শেষ দুই প্রকারের মুসলমান কম। এই সংগঠনের প্রধান হর্তাকর্তা কোন কোন জায়গায় কিছু আরব মুসলমান, আর কিছু কিছু জায়গায় উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের আমেরিকান মুসলমান। এই সংগঠনের সাথে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠন জড়িত আছে। এই কনভেনশনে তাদের সকল সংগঠনের প্রতিনিধিদেরকে দাওয়াত করা হয়েছিল। এছাড়া সৌদী আরব, মিসর, সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও পাকিস্তান থেকেও বিভিন্ন ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হয়েছিল।

কনভেনশনের আসল উদ্দেশ্য (যা সেখানে গিয়ে জানতে পারি) ছিল, সংগঠনের সাথে জড়িত আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের একটি সামাজিক সমাবেশ করা। এরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হবে। একে অপরের সমস্যাদি জানার ও বোঝার চেষ্টা করবে। আর সম্মিলিত বিনোদনের মাধ্যমে পরস্পরের নিকটবর্তী হবে। এই মৌলিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে একটি সেমিনারকেও অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার বিষয়বস্তু ছিল 'আমেরিকায় ইসলাম'। এই সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্যই আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল।

আমরা সেমিনারের জন্য প্রবন্ধ লেখার সময় পাইনি বলে উক্ত বিষয়ের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রস্তুত করতে পারিনি। আর সেখানে গিয়ে বুঝতে পারি যে, এই মঞ্চ গবেষণা সমৃদ্ধ কোন প্রবন্ধ পাঠের উপযুক্তও নয়। তাই প্রবন্ধের পরিবর্তে পাকিস্তানে থাকা অবস্থায় আমেরিকান মুসলমানদের যেসব সমস্যার কথা আমি জানতে পেরেছি এবং এখানে পৌঁছে যেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, সেসব সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা চার্লষ্টনে বসেই সাজিয়ে নেই এবং উদ্বোধনী অধিবেশনের পরের দিন সকালের অধিবেশনের শেষে তা পাঠ করি। অধিবেশনটি ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত হচ্ছিল, তাই আমি ইংরেজীতেই প্রবন্ধ লিখি। নীচে তার বিশেষ কথাসমূহের সারাংশ পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি।

আমেরিকায় ইসলাম

প্রাথমিক ভূমিকার পর অধম নিবেদন করি যে, সেমিনারের নোটিশ আমরা অতি অল্প সময় থাকতে পাই, তাই এ বিষয়ের উপর গবেষণালব্ধ কোন প্রবন্ধ পেশ করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। তবে এতদসংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ কথা আমি আপনাদের খিদমতে পেশ করার প্রয়াস পাব। আমার এ কথাগুলো মূলত একটি বার্তা, যা আমি আপনাদের মধ্যস্থতায় আমেরিকায় বসবাসকারী সকল মুসলমান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাই।

আমরা পাকিস্তানী মুসলমানগণ আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমান ভাইদের থেকে দৈহিকভাবে অনেক দূরে, তবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিষয়ে পাকিস্তানী মুসলমানদের এত গভীর আন্তরিকতা রয়েছে যে, মুসলমান পৃথিবীর যে কোন ভূখণ্ডেই বাস করুক না কেন, আমাদের অন্তর সর্বদা তাদের সঙ্গে স্পন্দিত হয়ে থাকে। বিধায় এই মহাদেশে ইসলাম ও মুসলমান যে সকল সমস্যার সম্মুখীন, সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণরূপে না হলেও সাধারণভাবে অবশ্যই অবগত।

'আমেরিকায় ইসলাম' এই বিষয়ের মূলত দুটি দিক রয়েছে। একদিকে এর সম্পর্ক রয়েছে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগের সাথে, আর অপরদিকে এর সম্পর্ক রয়েছে স্বয়ং মুসলমানদেরকেই প্রকৃত

মুসলমান বানানো এবং তাদেরকে সেভাবে টিকিয়ে রাখার সঙ্গে, অর্থাৎ এই বিষয়ের এও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, এই ভূখণ্ডের মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় স্বকীয়তা এবং ধর্মের মহত্বকে কিভাবে টিকিয়ে রাখাতে পারে। তবে আমি মনে করি যে, এ দুটি বিষয় পরস্পর এমন গভীরভাবে জড়িত যে, একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। কারণ, মুসলমানগণ ঐ সময় পর্যন্ত ইসলামের তাবলীগের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সঠিক অর্থে মুসলমান হয়ে ইসলামের হৃদয়গ্রাহী এক আদর্শ তুলে ধরতে না পারবে।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে যে, পাশ্চাত্যের দেশসমূহের অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং প্রচার ও প্রসারের জন্য বর্তমান যুগই সর্বাধিক উপযুক্ত। আর তার কারণ এই যে, বিগত কয়েক শতাব্দীকাল পাশ্চাত্যের লোকেরা অনেক ধরনের চিন্তা–ধারার ব্যবস্থাপনাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছে। তারা পোপ পূজা থেকে শুরু করে আল্লাহকে অস্বীকার করা পর্যন্ত যাবতীয় মতাদর্শ ব্যবহার করে পরীক্ষা করেছে। কিন্তু তারা তাদের জীবনে যত মতাদর্শ প্রয়োগ করেছে তার একটিও তাদেরকে জীবনের ভারসাম্যপূর্ণ কোন কর্মসূচী দিতে সক্ষম হয়নি। তাদের প্রাচীন ধর্ম জড়বাদী ও বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা সেই ধর্মকে কার্যত ছুড়ে ফেলে জড়পূজার আদর্শকে প্রয়োগ করেছে, তখন তারা বৈষয়িক সকল উন্নতি লাভ করার পরও আত্মার প্রশান্তি এবং মনের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারা চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহে ফাঁদ পাতার পরও তাদের হৃদয়ে যে অতৃপ্ত তৃষ্ণা উপলব্ধি করছে, তার কোন প্রতিকার এমন জীবনে পাওয়াই সম্ভব নয়, যা জড়বস্তুর ওপারে দেখার যোগ্যতা রাখে না।

এজন্য অধমের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতার এই পিপাসার্তদেরকে ইসলামের সীরাতে মুস্তাকীম দেখানোর এটিই উৎকৃষ্টতম সময়। তাদের সম্মুখে এ কথা প্রমাণ করার এটিই উপযুক্ততম সময় যে, একমাত্র আর শুধুমাত্র ইসলামই তোমাদেরকে এমন এক জীবন ব্যবস্থার সন্ধান দিতে পারে, যার মধ্যে বৈষয়িক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ধারা একত্রে চলতে সক্ষম।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আদর্শিক সংঘাতের হাওয়া চলছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, এই সংঘাত মীমাংসার অযোগ্য নয়। এ সংঘাতের একটি উত্তম সমাধান সম্ভব। যদি একে অপরের গুণাবলী গ্রহণ করার মানসিকতা ও প্রেরণা নিয়ে কাজ করে, তাহলে উভয়ের দ্বন্দ্বের সুন্দর সমাধান হতে পারে। এতে সন্দেহ নেই যে, পাশ্চাত্য জগত বিগত দিনগুলোতে বৈষয়িক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে এবং এই অঙ্গনে তার থেকে প্রাচ্যের অনেক কিছু শেখার আছে। অপরদিকে পাশ্চাত্য তার যাবতীয় বৈষয়িক উন্নতি সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেওলিয়া। তার এমন একটি আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনার তীব্র প্রয়োজন রয়েছে, যা তাকে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দান করতে সক্ষম। আর এটি অনস্বীকার্য সত্য যে, পাশ্চাত্য জগত ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও আধ্যাত্মিক এই দিক নির্দেশনা পেতে পারে না। আমার বিশ্বাস আছে যে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে যদি এই সন্ধি বাস্তবায়ন হয় যে, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বৈষয়িক অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হবে, আর পাশ্চাত্য তার থেকে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা অর্জন করবে, তাহলে একই পৃথিবীর এই দুই ভূখণ্ড ঐ মানবতার জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর ও গঠনমূলক সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে, যা আজ পরস্পর ঝগড়া–বিবাদ, অস্থিরতা, অজ্ঞতা, দরিদ্রতা ও দুশ্চরিত্রের অগ্নিকুণ্ডে ধুকে ধুকে মরছে।

আমেরিকায় যেসব মুসলমান বাস করছে, এটি তাদের বিশেষ দায়িত্ব যে, তারা ইসলামের বার্তাকে অমুসলিম স্বদেশীদের কাছে পৌছে দিবে এবং তাদের মধ্যে ইসলামী মতাদর্শের বিকাশ ঘটাবে। এটি নির্দিষ্ট কোন সংগঠন, দল বা জামাতের দায়িত্ব নয়, বরং এটি প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, চাই সে যেখানেই বাস করুক না কেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই মহান কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ নিজেরা সত্যিকারের ও প্রকৃত মুসলমান না হবে। এই বৈপ্লবিক কর্ম এমন সব লোকের হাতে সম্পাদন হতে পারে না, যারা শুধুমাত্র মৌখিক বা জন্মগতভাবে মুসলমান, কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামের কোন ঝলক বিদ্যমান নাই।

ইসলামের তাবলীগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাবশালী পদ্ধতি হলো নিজে ইসলামের উপর আমল করা। এমনিভাবে আলোচনাধীন বিষয়বস্তুর অপরদিক অর্থাৎ 'খোদ মুসলমানদের প্রকৃত মুসলমান হওয়া' আমাদের সামনে এসে যায়। আমি পূর্বেই নিবেদন করেছি যে, আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর ইসলামের তাবলীগের বিরাট এক দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। আর তারা সে দায়িত্ব শুধুমাত্র তখনই যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে, যখন তারা নিজেদের ধর্মীয় স্বকীয়তা ও তার মর্যাদা সংরক্ষণের যোগ্য প্রমাণিত হবে। যদি আমেরিকায় অবস্থান করে তারা অন্য আমেরিকানদের জীবনধারায় এমনভাবে একাকার হয়ে যায় যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার মত কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে তারা ইসলামের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করলেও তা এমন এক অস্পষ্ট জিনিসের দিকে দাওয়াত হবে, বাহ্যিক জীবনে যার কোন অস্তিত্ব তারা প্রমাণ করতে পারবে না।

আমেরিকার মুসলমানদের সর্বপ্রথম এ বিষয়ে নিজেদের ঈমান দৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি শাখায় তার বিধানাবলী সমানভাবে মনোমুগ্ধকর, কল্যাণকর ও অবশ্য করণীয়। তারপর আকাইদ থেকে শুরু করে কর্ম জীবনের প্রতিটি শাখায় পূর্ণ আস্থা ও আত্মনির্ভরতার সাথে সেসব বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে। এসব নিবেদনের আলোকে যদি আমরা ইসলামের সঙ্গে, আমাদের নিজেদের সঙ্গে ও আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের সঙ্গে সুবিচার করতে চাই, তাহলে আমাদের জীবন পদ্ধতির উপর পুনর্দৃষ্টি দিতে হবে এবং প্রত্যেক কাজকে ইসলামী আদর্শে ঢেলে সাজানোর ফিকির করতে হবে। যাতে করে আমরা এমন আদর্শ মুসলমান হতে পারি, যার প্রতিটি পদক্ষেপই মূর্ত তাবলীগ হয়ে দাঁড়াবে।

এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য দীর্ঘ চেষ্টা–সাধনার প্রয়োজন রয়েছে, তবে কয়েকটি সহজ প্রস্তাব আমি পেশ করছি, যেগুলোর উপর আমল করলে এই লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম হবে, ইনশাআল্লাহ।

১. আমেরিকায় বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলিম পরিবার ২৪ ঘন্টা থেকে কমপক্ষে আধাঘন্টা সময় ইসলামী শিক্ষা অর্জন ও ইসলামী বই–পুস্তক

অধ্যয়নের জন্য নির্ধারণ করবে। এই আধা ঘন্টা সময় পরিবারের সকল সদস্য সম্মিলিতভাবে ইসলামী আকায়েদ, আহকাম তথা বিধিবিধান, ইতিহাস ও সীরাত সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে। বিশেষ করে শিশুদেরকে ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান ও পবিত্র কুরআনের তা'লীম দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবে।

২. প্রত্যেক মুসলমান, সে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হবে। নামায ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। নামায ছাড়া ইসলামী জীবন পালনের সকল প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ বরং ব্যর্থ হবে।

৩. প্রত্যেক মুসলমান নিজের বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে ইসলামী সামাজিকতার পরিপূর্ণ অনুগত থাকবে।

৪. প্রত্যেক মুসলমান এ কথার অঙ্গীকার করবে যে, সে যখন এবং যেখানে সুযোগ পাবে নিজের আশেপাশের অমুসলিমদের নিকট উপযুক্ত আঙ্গিকে ইসলামকে পেশ করবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন, যেন আমরা তাঁর সকল বিধিবিধান ও আইন-কানুন নিজেরাও মেনে চলতে পারি এবং ইসলামের বার্তা উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতম পন্থায় অন্যদের নিকট পৌছানোরও যোগ্য প্রমাণিত হই। আমীন-ছুম্মা আমীন।

এই ভাষণে অধম যা কিছু নিবেদন করেছি, পূর্ণ নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের সাথেই করেছি। কিন্তু সীমিত সে সমাবেশে এই দুর্বল ও ক্ষীণ আওয়াজ কার্যত কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করবে, তা আল্লাহই অবগত আছেন।

কনভেনশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ডঃ তানযীলুর রহমান সাহেবও 'বর্তমান যুগে মুসলমানদের সমস্যাবলী' শিরোনামে উপস্থিত ভাষণ দান করেন। জনাব খালেদ ইসহাক সাহেবও একসময় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি আমেরিকান অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলমানদের যে কর্মপন্থা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

তিন দিন পর্যন্ত কনভেনশন চলতে থাকে। এর একটি উপকারী দিক

এও ছিল যে, আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সংগঠনসমূহের যেসব প্রতিনিধি একত্রিত হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেখানকার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমরা অবগত হই। হোটেল হলিডে ইন–এরই একটি হলকক্ষে জুমুআর নামায আদায় করা হয়। যেসব সাধারণ মুসলমান এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন, হয়ত তাদের ইসলামী ইবাদত প্রভৃতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞানও অর্জন হয়। কিন্তু বাস্তব এই যে, এ সমাবেশ দ্বারা যে কাজ নেওয়া সম্ভব ছিল, অধমের মতে তা নেওয়া হয়নি। যেসব সাধারণ মুসলমান এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন, তাদের সিংহভাগ এমন আমেরিকান মুসলমান, যাদের পিতা–পিতামহ বহু বছর ধরে আমেরিকায় বাস করছে। এরা আমেরিকাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই বড় হয়েছেন। আমেরিকান সভ্যতা ও সামাজিকতা ছাড়া তারা কিছুই দেখেননি। সুতরাং তাদের চেহারা–সুরত, লেবাস–পোশাক, রং–ঢং, ভাষা ও বিবৃতির কোন বস্তুই তারা যে মুসলমান তা বুঝায় না। তারা মুসলমান, একথা জোর করে না বললে তাদেরকে মুসলমান বুঝতে পারা কঠিন। তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছেন, যারা নামায পড়তে জানেন না। তাই এই সমাবেশ দ্বারা সুশৃংখলভাবে তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার সাথে পরিচিত করানোর মত বড় একটি ফায়দা অর্জন করা দরকার ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোন নিয়মতান্ত্রিক প্রোগ্রামের অধীনে এই কাজ করা হয়নি। অধম এ বিষয়ে সমাবেশের ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কথা বললে তারা এই ওজর তুলে ধরেন যে, এসব লোক নিজেদের রুচি, প্রকৃতি, অভ্যাস ও জীবন পদ্ধতির দিক থেকে একশ ভাগ আমেরিকান হিসেবে গড়ে উঠেছে। এজন্য বর্তমানে আমাদের সামনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কমপক্ষে মৌখিকভাবে হলেও তাদেরকে মুসলমান রাখতে সফল হওয়া। আর যদি এ সময় তাদের উপর তাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন নিয়ম আরোপ করা হয়, তাহলে এই মৌখিক স্বীকৃতি থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং তাদেরকে অত্যন্ত মন্থরভাবে এবং কৌশলে মুসলমানদের সঙ্গে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সমাবেশ পরিচালকদের এই ওজর কিছুটা সত্যও বটে। কিন্তু এই

কনভেনশন চলাকালে পিকনিক, নৌবিহার ও ডিনারের প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল। সেগুলোতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েও ইসলামের কোন ঝলক দেখা যাচ্ছিল না। শুধু তাই নয়, বরং এমন কিছু বিষয়ও প্রোগ্রাম চলাকালে সামনে আসে, যেগুলো দেখে কপাল ঘর্মসিক্ত হয়। কৌশল ও মন্থরতা যথাস্থানে ঠিক আছে, তবে এসব ঠিক রেখেও এই প্রোগ্রামকে লক্ষ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক বরং প্রশিক্ষণমূলক ও ফলপ্রসূ বানানো সম্ভব ছিল।

প্রতিক্রিয়া

চার্লষ্টনের পরে ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কেও অবস্থান করি। আমেরিকার পর প্রায় এক সপ্তাহকাল লণ্ডনেও কাটাই। এতদিন পাশ্চাত্যের জীবনধারাকে কিতাবে পড়েছিলাম এবং মানুষের মুখে শুনেছিলাম, এবার তা কাছে থেকে দেখার সুযোগ হলো। কিতাব অধ্যয়ন করে আমার অন্তরে পাশ্চাত্যের বৈষয়িক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক দেওলিয়াপনার যে চিত্র জন্মেছে, তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। তাদের কিছু কিছু জিনিস দেখে আফসোস হলো যে, এগুলো তো মুসলমানদের কাজ ছিল। আর অনেক জিনিস দেখে শিক্ষা লাভ হলো যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মহামূল্যবান ঈমান দান করে এবং ইহ–পরকালের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসত্বের সম্মানে ভূষিত করে কত বড় অনুগ্রহ করেছেন। আর এরা এসব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে পতনের কোন গহ্বরে পতিত হয়েছে!

বাস্তব এই যে, একজন ঈমানদার ব্যক্তির মানসে এই পাশ্চাত্য জীবন প্রত্যক্ষ করে এত বেশি বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, সে বিমূঢ় হয়ে যায়। এসব জাতির কিছু কিছু কাজ দেখে মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধন্যবাদসূচক শব্দ বের হয়ে আসে। অপরদিকে তাদের জীবনেরই এমন কিছু দিক রয়েছে, যেগুলো দেখে আপনা আপনি অভিসম্পাত করতে ইচ্ছা হয়।

পাশ্চাত্যের জীবনধারার আলোকময় দিক

তাদের জীবনের আলোকময় দিক এই যে, তাদের মধ্যে মোটের উপর কর্মোদ্দীপনা, পরিশ্রম, জাতীয় চেতনা ও সামাজিক চেতনার প্রাচুর্য

রয়েছে। আমাদের মধ্যে তো তাদের বিলাস–ব্যাসনের কথা সবার মুখে ছড়িয়ে আছে। পক্ষান্তরে তাদের কর্মনিষ্ঠা এমন যে, তারা সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে কাজ করে থাকে। এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন প্রকারের কাজে চুরি, ঘুষ, অনিয়ম ও অলসতাকে তারা প্রশ্রয় দেয় না। কোন সরকারী অফিসে কারো কোন কাজের প্রয়োজন হলে বিনা কারণে তাকে ঘোরাঘুরি করতে হয় না। বরং সে আইনের দাবী পুরা করে থাকলে সাথে সাথে তার কাজ হয়ে যায়। ঘুষের ব্যাধি খুব কমই দেখা যায়। কাজ–কাম সাধারণত পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার ও সততার সাথেই সমাধান করা হয়। নগরবাসীদের পানাহারের সামগ্রীসমূহে ভেজাল বা প্রতারণার কোন ভয় নেই। তাদের পারস্পরিক কর্মপদ্ধতি মোটের উপর নিতান্ত ভদ্রজনোচিত এবং সৎ স্বভাবপূর্ণ। আমার সেখানে অবস্থানকালে কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ, রাগারাগি বা ঝগড়াঝাটির ঘটনা ঘটেনি। অথচ একদম সাধারণ মানুষের সাথেও অনেক কাজ করতে হয়েছে। যেসব জায়গায় দুয়ের অধিক লোক কোন কাজের জন্য প্রতীক্ষা করছে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া তারা নিজে নিজেই সারিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যত বেশি ভীড়ই হোক না কেন, ইচ্ছা করে কেউ সারি ভাঙ্গার চেষ্টা করে না। ট্রেনে ও বাসে আরোহণকালে যত তাড়াই থাকুক না কেন, কেউ কাউকে ধাক্কা মারে না। বরং অনেক সময় অন্যকে আরোহণ করার সুযোগ করে দেয়। সাধারণ স্থানসমূহে যেমন, রেস্তোরাঁ, ট্রেন, বাস ও সড়কের উপর জোরে কথা বলার নিয়ম নেই। সকলে নিম্নস্বরে কথা বলে থাকে। সুতরাং বড় বড় সমাবেশস্থলেও হৈচৈ হয় না।

পাতাল ট্রেনের বড় বড় বগি লোক দ্বারা পূর্ণ থাকে। কিন্তু লোকেরা হয় পেপার, নাহয় কোন পুস্তক পড়তে থাকে, অথবা নীরব বসে থাকে। কোন কথা বলার সময় আস্তে কথা বলে। কোন বৃদ্ধ বা অসুস্থ লোক বাসে বা ট্রেনে উঠতেই লোকেরা তার জন্য সীট খালি করে দেয়। অপরিচিতদেরকে পথ বলে দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। অনেকবারই এমন হয়েছে যে, আমরা কোন পথ তালাশ করছি, আর স্থানীয় লোকেরা শুধুমাত্র আমাদের অবস্থা দেখে উপলব্ধি করে

আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতো, আমরা কোন্ জায়গার খোঁজ করছি।

আমাদের দেশের মত সাধারণত ট্যাক্সি ড্রাইভাররা মিটারের বেশি পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার চিন্তায় থাকে না। একবার নিউইয়র্কে আমাদের ট্যাক্সির ভাড়া মিটার হিসাবে ৯ ডলার কয়েক সেন্ট হয়। আমি ড্রাইভারকে দশ ডলারের নোট দেই। তার নিকট ভাংতি ছিল না। সে গাড়ী থেকে নেমে একটি দোকানে গেল। সেখান থেকে নোট খুচরা করে এনে উদ্বৃত্ত পয়সা আমার হাতে দিল। তারপর বলল, আমি আপনার মালপত্র উঠিয়েছিলাম, আপনি চাইলে অতিরিক্ত কিছু বখশিশও দিতে পারেন।

এ সকল দেশের বিশেষ করে আমেরিকার নাগরিক সুবিধা এবং সুন্দর ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য। আয়তন ও বসতির দিক থেকে নিউইয়র্ক করাচীর তিনগুণ তো অবশ্যই হবে। সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত এই শহরটি কয়েকটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। দ্বীপগুলোর মধ্য দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। সুদৃশ্য কয়েকটি পুল দ্বারা দ্বীপগুলোকে পরস্পর মিলিত করা হয়েছে। এত বড় শহরেও ট্রান্সপোর্ট কোন সমস্যা নয়। বিশেষত পাতাল লোকাল ট্রেনের ব্যবস্থা এত সহজ ও আরামদায়ক যে, পার্কিং ও অন্যান্য কারণে প্রাইভেট কারে সফর করা জটিল, কিন্তু এসব ট্রেনে ভ্রমণ করা সহজ। সারা শহরে পাতাল ট্রেনের এমন বিস্তৃত জাল রয়েছে এবং তাতে প্রতি দু' মিনিট পরপর এত প্রচুর ট্রেনের ব্যবস্থা রয়েছে যে, শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করা কোন ব্যাপারই নয়। ৫০ সেন্টের একটি টোকেন সংগ্রহ করে আপনি শহরের এক মাথা থেকে অপর মাথা পর্যন্ত যেতে পারেন।

টেলিফোনের মাধ্যমেই বিমানের বুকিং পাকাপোক্ত করা যায়। এয়ার কোম্পানীর আস্থা রয়েছে যে, সফর মূলতবী হলে যাত্রী বুকিং রহিত করাতে ভুলবে না। আভ্যন্তরীণ ভ্রমণে বিমান বন্দরে সাধারণত দেরী হয় না। নিউইয়র্কে ও ওয়াশিংটনে রানওয়েতে উড্ডয়নকারী জাহাজের এমন সারি বেঁধে থাকে, যেমন ট্রাফিক সিগন্যালে প্রাইভেট কারের সারি হয়। এতদসত্ত্বেও বিমান বিলম্ব হওয়ার ঘটনা কদাচিৎই দেখা যায়। যেখানে এয়ারবাস সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে আপনি বিমান ওড়ার পাঁচ মিনিট পূর্বে পৌছলেও পূর্ব বুকিং ছাড়াই বিমান কোম্পানী আপনাকে সিট

দিতে বাধ্য। সেজন্য আরেকটি বিমান পাঠাতে হলেও পাঠাবে। বরং ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্ক যাওয়ার সময় তো আমরা বিমান ওড়ার মাত্র তিন মিনিট পূর্বে বিমান বন্দরে পৌছি। এই তিন মিনিটেই কাউন্টার ব্রিফিং হয়ে যায়, সামানা চলে যায়, আমরা বিমানে আরোহণ করি এবং সময়মত প্লেনও উড়ে যায়।

কম্পিউটার জীবনকে সীমাহীন গতিময় করে দিয়েছে। প্রতি পদক্ষেপে মেশিনের বিরল ও বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী নজরে পড়ে। যদি আপনার টাকা ব্যাংকে জমা থাকে এবং রাত্রিবেলায় ব্যাংক বন্ধ থাকা অবস্থায় টাকার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে কম্পিউটারের মাধ্যমে আপনার চাহিদা মত অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। নিউইয়র্কে কোন কোন এলাকা অত্যন্ত গান্ধাও আছে। তবে মোটের উপর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নগরের সৌন্দর্য খুব উঁচুমানের। মোটকথা, শহরের অধিবাসীদের জন্য নাগরিক সুবিধাদি প্রদানে যে মেধা, সূক্ষ্মদর্শিতা, পরিশ্রম ও সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা প্রশংসা ও ধন্যবাদযোগ্য।

পাশ্চাত্য জীবনধারার অন্ধকার দিক

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহের শুধুমাত্র একদিকের এ সব বৈশিষ্ট্য দূর থেকে শুনলে বাহ্যত এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এলাকাটি শান্তি ও নিরাপত্তার আকর। এখানে শান্তি ও স্বস্তির যুগ বহমান। অপরাধ ও দূর্নীতির বীজ এখান থেকে চিরতরে শেষ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়কর বাস্তবতা এই যে, পাশ্চাত্যের জীবনে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী থাকা সত্ত্বেও এসব ধারণার উত্তর পুরোটাই নেতিবাচক। নাগরিক সুবিধাদি, অর্থনৈতিক ব্যাপক সচ্ছলতা, কারবারে পরিচ্ছন্নতা, নৈতিকতা ও ভদ্রতার যে নমুনা অধম উপরে উল্লেখ করেছি, তা তাদের বৈশিষ্ট্যাবলীর একটি দিক মাত্র। এ জাতীয় আরো অনেক কিছুই এর সাথে যোগ করা যেতে পারে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের লোকদের জীবনের অপরদিক নিতান্ত অন্ধকার, ভয়ঙ্কর এবং উপরোক্ত গুণাবলীর সাথে বিস্ময়করভাবে বিরোধপূর্ণ।

সেখানকার অবস্থা এই যে, অঢেল টাকা–পয়সা থাকা সত্ত্বেও চুরি,

পকেটমারা, সিঁদকাটা এবং ডাকাতির ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার। যে সমাজে আমানতদারী, সাধুতা ও পরিচ্ছন্ন লেনদেনের ঈর্ষাযোগ্য দৃশ্যাবলী নজরে পড়ে, অপরদিকে ঐ সমাজেরই এই অবস্থা যে, কোন পথিকই পকেটমার ও ঠকদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। পথ চলতে চলতে কেউ একজন নিকটে এসে মনোযোগ আকৃষ্ট করে, আর পর মুহূর্তেই তার ক্ষুদে পিস্তল পথিকের দিকে তাক করে তাকে চ্যালেঞ্জ করে। ফলে সে দিন দুপুরে নিজের পকেট খালি করে দিতে বাধ্য হয়। পথ কিছুটা নির্জন হলে পথচারীকে থামিয়ে মাথায় জোরে আঘাত করে বেহুঁশ করা হয়। তার জানমাল আঘাতকারীর হাতে চলে যায়। আক্রমণের এই বিশেষ পদ্ধতিকে (Mugging) বলা হয়। অপরাধের এ কৌশলের প্রয়োগ দিন দিন বেড়েই চলছে।

সিঁদকাটা, লুট, ছিনতাই ও ডাকাতি নিত্যদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে যেসব হোটেলে ভিনদেশী লোক অবস্থান করে, সেগুলোতে নিত্য নতুন পন্থায় ডাকাতি করা হয়। যে কারণে আমেরিকার সব হোটেলের কক্ষের দরজায় ছিঁটকিনি ছাড়াও শিকল লাগানো থাকে, যেন দরজা খোলা সত্ত্বেও তা আটকে থাকে এবং যে ব্যক্তি দরজা খুলে দেবে, সে কোনরূপ প্রতারণার শিকার হলে পুনরায় দরজা লাগিয়ে দিতে পারে। অনেক হোটেলে নোটিশ লাগানো আছে যে, রাত নয়টার পর হোটেলের দরজা তালাবদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর কোন মুসাফির এলে প্রথমে ব্যবস্থাপকের সঙ্গে কথা বলে, সে যে মুসাফির তা নিশ্চিত করে পরে হোটেলে প্রবেশ করবে। ইতিপূর্বে নিউইয়র্কে একবার কয়েক ঘন্টার জন্য বিদ্যুৎ চলে গেলে লুট ও ছিনতাইয়ের যে প্লাবন বয়ে যায়, তার আওয়াজ সারা বিশ্বের মানুষ শুনেছে। এটি এমন এক সমাজের নিরাপত্তা এবং জানমালের হেফাজতের মান, যার পুলিশ অত্যন্ত চৌকস, ট্রেনিংপ্রাপ্ত, দায়িত্ব সচেতন ও কর্মঠ। যে সমাজের জাঁকজমকপূর্ণ নাগরিক সুবিধা, ব্যবস্থাপনা এবং অনুপম নৈতিকতার বর্ণনা আপনারা একটু পূর্বে পাঠ করেছেন।

তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণের পন্থা দেখে বিহ্বল হতে হয় যে, সেই জাতি, যাদের আভিজাত্য ও নৈতিকতার প্রকাশ উপরের আলোচনায়

আমরা দেখে এসেছি, তার শুধুমাত্র বিনোদন কেন্দ্রগুলোতেই নয়, বরং আলোকিত সড়কে, লোকারণ্য বাজারে, ট্রেনে, বাসে ও জনসমাগমের স্থানে সর্বসাধারণের সম্মুখে চুম্বন, আলিঙ্গন ও জৈবিক স্বাদ উপভোগ করা তাদের জন্য এক সাধারণ ব্যাপার। সারাদিনে যার পাঁচ সাতটি দৃশ্য ইচ্ছায় অনিচ্ছায় চোখে পড়বেই। নারীদের নগ্নতা দোষের হওয়া তো দূরের কথা, হয়তবা গর্বের বস্তু মনে করা হয়। তাদের দেহে কাপড় নামের যা কিছু থাকে, লজ্জা নিবারণের দৃষ্টিতে তার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ বিশেষ স্থানে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হওয়াতেও কোন দোষ মনে করা হয় না। জায়গায় জায়গায় Nude Dancers (উলঙ্গ নর্তকী) এর সাইন বোর্ড স্বগর্বে লাগানো দেখা যায়। পোষ্টার ও হ্যাণ্ডবিল 'রূপসীদের সমাবেশ' (Beauty Parlours) নামে খোলা বাজারে প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়। নিউইয়র্কের একটি বাজার অতিক্রমকালে একটি হ্যাণ্ডবিল আমাদের মত লোকের হাতেও গুঁজে দেওয়া হয়। তাতে কয়েকটি নগ্ন ছবির সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল Play with our bodies অর্থাৎ 'আমাদের দেহের সাথে খেলা করুন'। এ লেখাটি একজন ভদ্রলোকের পক্ষে পড়াও মুশকিল। মোটকথা, জৈবিক চাহিদা পূরণের পদ্ধতিতে এই জাতি নিঃসন্দেহে কুকুর, বিড়ালের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

উপরন্তু আরও বিস্ময়কর ও চূড়ান্ত শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে সমাজে নারী এত সস্তা এবং তাকে উপভোগ করা এত সহজ যে, নারী আস্বাদনের জন্য নির্জনতাও প্রয়োজনীয় নয়। যেখানে স্বেচ্ছা ব্যভিচার শুধু আইনগতভাবেই নয়, বরং সমাজ এবং বিবেকের দৃষ্টিতেও কোনরূপ দোষণীয় নয়, ঠিক এ সমাজেই বলপূর্বক ধর্ষণের এত অধিক ঘটনা ঘটে যে আল্লাহ রক্ষা করেন।

ব্যভিচার ছাড়া সমকামিতার প্রবণতাও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরস্পর সন্তুষ্ট থাকলে এই মানব বিধ্বংসী কুরুচিপূর্ণ কাজে দোষের কিছু নেই মনে করা হয়। আমরা সেখানে থাকাবস্থায় 'সমকামিতা' বিষয়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় লেখালেখি চলছিল। আমরা মনে করেছিলাম, এর বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে হয়ত আলোচনা থাকবে, কিন্তু পরে জানতে পারলাম, তারা এ ধাপও অতিক্রম করে গেছে। এখন

সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, এই নীতিহীনতা মূলত দোষের কিছু নয়। তবে এই কাজে কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্য করা হবে কিনা এটাই এখন আলোচনার বিষয়।

মদ্যপান করা তো এ সমাজে একটি পবিত্র (?) আমল। পদে পদে শরাবখানা বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও বেআইনী কারবার জোরদার। তরুণদের মধ্যে আফিম ও চরস প্রভৃতির ব্যবহার ব্যাপক। আরাম আয়েশের সামগ্রী, নাগরিক সুবিধাদি এবং বিলাস ব্যাসনের সহজলভ্যতা সত্ত্বেও তাদের অন্তরে শান্তি নেই। ফলে নিদ্রাহীনতার অভিযোগ ব্যাপকতর হচ্ছে এবং ঘুমের ঔষধের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানবতার আর্তনাদ

বাহ্যিক নৈতিকতার উপরোক্ত মান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন ভিন্ন। আত্মীয়দের সঙ্গে ভালোবাসা ও হৃদ্যতার দাবী ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হতে চলেছে। আমেরিকান সমাজে বার্ধক্য মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্টতর। বৃদ্ধদের জন্য পৃথক আশ্রম রয়েছে। সেখানে তাদের পানাহারের ব্যবস্থা তো রয়েছে, কিন্তু সামান্য ভালবাসার জন্য তারা হা–হুতাশ করতে থাকে, যে ভালবাসা একমাত্র রক্তের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য। বড় বড় বিত্তশালী লোকের মাতাপিতা সেসব আশ্রমে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকে। তাদের সন্তানেরা কয়েক মাস বরং অনেক সময় কয়েক বছরেও তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায় না। আর যেসব বৃদ্ধ ঘরে থেকে যায়, তারা কথা বলার জন্যও কাউকে পায় না। এসব বৃদ্ধদের পক্ষ থেকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও ছাপা হয় যে, 'এই ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে কথা বলুন।' অনেক সময় এই সহমর্মিতার জন্য বিনিময়ও প্রদান করা হয়। একাকিত্বে উত্যক্ত বৃদ্ধেরা শুধুমাত্র কিছু সময় কথা বলার জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে বিভিন্ন লোকের নিকট ফোন করে থাকে।

নারী স্বাধীনতা , না নারী নির্যাতন?

পাশ্চাত্য সমাজে সবচেয়ে বেশি করুণার পাত্র নারী সম্প্রদায়। এ অবলাদেরকে মর্মান্তিক বোকা বানিয়ে তাদের সঙ্গে যেই প্রতারণার খেল

খেলা হচ্ছে এ সম্পর্কে আমার পূর্বেও ধারণা ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহ স্বচক্ষে দেখার পর এর মর্মান্তিক করুণ অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি পরিস্কার হয়ে বুঝে এসেছে। মুখে তো বলা হয় যে, আমরা নারীদেরকে পুরুষদের সমান্তরালে আনতে চাই, কিন্তু কার্যত এই হয়েছে যে, সমাজের নিম্নমানের যত কাজ রয়েছে, তার সবগুলো না হলেও বেশির ভাগই নারীদের হাতে অর্পিত। এ সময় আমাদের অনেক হোটেলেই যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। সেখানে পুরুষ বেয়ারা কালেভদ্রে দেখা যায়। সচরাচর নারীদের উপরই এই কাজ ন্যস্ত রয়েছে। দোকানে মাল বিক্রির কাজও বেশির ভাগ নারীরাই করে থাকে। হোটেলের ডেস্কে সাধারণত নারীদেরকে দেখা যায়। বিশ্বের কোন সামগ্রীর বিজ্ঞাপন নারীদের ছাড়া প্রায় অসম্ভব। আর যেসব কাজের সম্পর্ক জনসাধারণের সাথে সেগুলোও নারীদের দায়িত্বে অর্পিত। বাড়ীর বাইরের এসব দায়িত্ব পালনের পর নারীরা গৃহকর্ম থেকে ছুটি পেয়ে যায়, তা নয়। বাড়ীর দেখাশোনা ও শিশুদের যত্নআত্তি সাধারণত পুরোপুরি তাদের দায়িত্বেই। বরং এই স্বাধীনতার ফলে বাড়ীর বাইরের কাজসমূহ যেমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা প্রভৃতিও নারীদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। অনেক মহিলা অফিসের ডবল ডিউটি পালন করার পর বাড়ীতে গিয়ে খাবার তৈরী করা, ঘর পরিস্কার করা এবং শিশুদের দেখাশোনা করার দায়িত্বও সম্পাদন করে থাকে। উপরন্তু তাদের সামাজিক মর্যাদা এই যে, যে কোন পুরুষ তার মনকে উদ্বুদ্ধ করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে এবং নিজের ইচ্ছামত সর্বসমক্ষে তার নৈকট্য দ্বারা তৃপ্তি লাভ করতে পারে। আবার যখন মন ভরে যাবে, তখন তাকে ছেড়ে অন্য কারো সাথে সম্পর্ক করতে পারে।

সারকথা এই যে, পাশ্চাত্যের পুরুষরা নারীদেরকে পদে পদে উপভোগও করতে চায়, আবার তাদের দ্বারা নিজেদের ব্যবসাও চমকাতে চায়, কিন্তু তারা কোনরূপ দায়িত্ব বহন করতে তৈরী নয়। এই স্বার্থসিদ্ধির প্রতারণাকে বৈধতার সনদ প্রদানের জন্য এর নাম রেখেছে 'নারী স্বাধীনতার আন্দোলন'। দাবী করা হয় যে, আমরা নারীদেরকে পুরুষদের সমানে দাঁড় করাতে চাই এবং তাদেরকে উচ্চতর পদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে

চাই। কিন্তু কার্যত হয়েছে এই যে, সাধারণত সমাজের তৃতীয় শ্রেণীর কাজ নারীদের হাতে অর্পিত এবং উচ্চতর পদগুলোতে যথাপূর্ব পুরুষদেরই আধিপত্য রয়েছে।

পাশ্চাত্যের দেশসমূহের একটি স্বাভাবিক সমীক্ষা নিয়ে দেখুন যে, সেখানে কতজন নারী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মন্ত্রীসভায় নারীদের হার কি পরিমাণ? সংসদ ও সিনেটে পুরুষদের তুলনায় মহিলা সদস্য কতজন? বাস্তব এই যে, পাশ্চাত্যের কোন একটি দেশেও এসব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নারীর সংখ্যা সম্ভবত পঁচিশ ত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু এই কয়েকজন মহিলাকে উচ্চপদে পৌছানোর লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ নারীকে এমনভাবে পথে নিক্ষেপ করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য এই তৃতীয় শ্রেণীর কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু নারীদের এই সর্বমূখী লাঞ্ছনার আকর্ষণীয় নাম 'নারী স্বাধীনতা' রাখা হয়েছে। আর যেসব সমাজে নারীদেরকে গৃহকর্ত্রী বানিয়ে তাদের মাথায় সতীত্বের মুকুট পরানো হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতা এবং পশ্চাতপদতার ঢোল পিটিয়ে পাশ্চাত্য জগত তাদের এই প্রতারণাকে বৈধতার সনদই শুধু দেয়নি, বরং অবলা নারীদেরকে এটি বিশ্বাসও করিয়েছে যে, একমাত্র পাশ্চাত্য জগতই নারীদের অধিকার সংরক্ষণের পতাকা বহন করছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের নারীদের করুণ দিক এই যে, অবলা নারী সম্প্রদায় তাদের নিপীড়িতা হওয়ার বিষয়েও খবর রাখে না। আর যেসব ডাকাতেরা তাদের সম্মান ও মর্যাদা ধুলিস্মাৎ করছে, তাদেরকেই তারা নিজেদের মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহ সম্পর্কে আমার সফরকালে স্বচক্ষে দেখা কিছু বিষয় কোনরূপ পক্ষপাতদুষ্টতা বা স্বেচ্ছা অতিরঞ্জন ছাড়া উপরে তুলে ধরেছি। স্বচক্ষে দেখা এসব ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে অধমের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, পাশ্চাত্য জগতে ইসলাম প্রচারের এটিই সর্বোৎকৃষ্ট সময়। পাশ্চাত্যের জনসাধারণ এই দিক থেকে করুণার পাত্র যে, তারা বৈষয়িক উন্নতির শিখরে আরোহণের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করা সত্ত্বেও এই পৃথিবীতেই সে সব উন্নতির অনেক সুফল থেকে বঞ্চিত। আর পরকালীন

দৃষ্টিতে তো তাদের ভাণ্ডার পুরোপুরিই শূন্য। পাশ্চাত্য সফরকালে পবিত্র কুরআনের এ সকল আয়াত আমার কানে বার বার গুঞ্জরিত হতে থাকে—

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

অর্থ ঃ "আল্লাহ শুধু এই চান যে, এসব বস্তু দ্বারা পার্থিব জীবনে তারা আযাবে আক্রান্ত থাকবে, আর কুফুরী অবস্থায় তাদের প্রাণ নির্গত হবে।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত ৫৫)

এবং

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ-

অর্থ ঃ তোমাকে যেন প্রতারিত না করে, নগরে নগরে কাফেরদের আনাগোনা। এটা কয়েক দিনের বসন্তমাত্র। এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটি অতি নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল।

(সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯৬–১৯৭)

বাস্তব এই যে, আমাদের পক্ষ থেকে পাশ্চাত্যে ইসলাম প্রচারের নিয়মতান্ত্রিক, সুসংহত ও নিষ্ঠাপূর্ণ কোন পরিশ্রম এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। মুসলমানদের যেসব ছোট ছোট সংগঠন বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সকল মনোযোগ তাদের নিজস্ব সমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর আমাদের পাপের পরিণামে এসব সংগঠনও পরস্পর মতবিরোধ, বিশৃংখলা ও বিবাদ বিসম্বাদের শিকার। শুধুমাত্র তাবলীগ জামাআতের সাদাসিধা ও নিষ্ঠাপূর্ণ কিন্তু সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা অমুসলিমদের দিকেও মনোযোগী। বিশেষত ইংল্যাণ্ডে তাদের প্রচেষ্টার অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে ব্যাপক কোন কাজ হয়নি এবং আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সাহিত্য সম্ভারও নেই। নেই তেমন কোন পরিকল্পনা এবং শ্রম ও কর্মের মনোপূত উদ্দীপনা। এমত অবস্থায় পাশ্চাত্য জগতে

কাজ করার অনেক বিস্তৃত ময়দান মজুদ রয়েছে। এ লাইনে যদি সুসংহতভাবে কাজ করা হয়, তাহলে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যাবে। সেখানে কোন্ কোন্ দিকে কি কি কাজের আবশ্যক রয়েছে, এটি একটি স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচ্য বিষয়। এ ব্যাপারে অনেকগুলো কর্মসূচী আমার মনে রয়েছে, কিন্তু এখানে তা তুলে ধরার সুযোগ নেই। বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কোন সুযোগে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

আমেরিকা থেকে ফেরার পথে প্রায় এক সপ্তাহকাল লণ্ডনে অবস্থান করি। সেখানে ইসলামিক সেন্টার এবং আরো কয়েকটি মসজিদে ভাষণ দানের সুযোগ হয়। ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরবাসীর পক্ষ থেকেও সেখানে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়। কিন্তু পবিত্র রমাযান নিকটবর্তী হওয়ায় আমরা সফরকে সংক্ষিপ্ত করি এবং (মিসরের পঞ্জিকা অনুপাতে) শাবানের ২৯শে রাত্রিতে লণ্ডন থেকে কায়রো যাত্রা করি। পথিমধ্যে ইটালীর রাজধানী রোম এবং গ্রীসের রাজধানী এথেন্সেও সামান্য সময়ের জন্য বিমান বিরতি করে। এরপর সকাল ৮টার কাছাকাছি আমরা কায়রো পৌঁছে যাই। এখানে দুদিন এক রাত্রি অবস্থান করি। কায়রো বহু শতাব্দী ধরে আলমে ইসলামের বিশিষ্টতম জ্ঞানকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ। এজন্য এখানে বেশি দিন অবস্থান করা দরকার ছিল। কিন্তু পবিত্র হেজাযে পবিত্র রমাযানের সূচনা হওয়ার বাসনাও অন্তরে ছিল। তাই এখানকার হক আদায় করতে পারিনি। এখানকার দুদিনের অবস্থানে শুধুমাত্র আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে হালকাভাবে দেখি। এতদ্ব্যতীত কায়রোর সেই যাদুঘর দেখারও সুযোগ ঘটে, যেখানে ফেরাউন ও তার বেগমদের মমিকৃত লাশ সংরক্ষিত আছে। এটি বিরাট একটি শিক্ষণীয় স্থান, যেখানে খোদা হওয়ার দাবীদার পাথর হয়ে পড়ে আছে এবং পবিত্র কুরআনের এই বাণীর সত্যতার সাক্ষী দিচ্ছে।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

অর্থ ঃ অতঃপর আজ আমি তোমার দেহকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি, যেন তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়ে যাও।

একটি ভুল ধারণার অবসান

কায়রো অবস্থানকালে একটি মারাত্মক ভুল ধারণার পরিষ্কারভাবে অবসান হয়। এ কথাটি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ আছে যে, মিসরে চন্দ্রবর্ষের পঞ্জিকার হিসাব অনুমানের উপর সাজানো হয়। চাঁদ দেখার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব সেখানে নেই। কিন্তু যেদিন আমরা কায়রো পৌঁছি, সেদিন এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। সেখানকার হিসাবে এটি চাঁদ ওঠার রাত ছিল। আমরা জানতে পারি যে, সেখানে প্রতি বছর ২৯শে শাবান এশার নামাযের নিকটবর্তী সময়ে 'রমাযানের সংবর্ধনা' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। তাতে মিসরের বিশিষ্ট আলেম, সরকারী কর্মকর্তা এবং শহরের অভিজাত লোকেরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি রেডিও এবং টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়। সেদিনের অনুষ্ঠানে মিসরের মুফতী শায়েখ আহমাদ আল খিজির ছাড়াও প্রেসিডেন্ট সা'দাতের প্রতিনিধিরূপে কায়রোর গভর্নরও উপস্থিত ছিলেন। এতে মিসরের মুফতী সাহেব আলেমসুলভ এক ভাষণ দিতে গিয়ে সেসব লোকদের মতের খোলাখুলি প্রতিবাদ করেন, যারা রমাযান ও ঈদ প্রভৃতি ইবাদাতের জন্য পঞ্জিকার নির্ধারিত হিসাবকে চূড়ান্ত মনে করে। তিনি বলেন যে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে চাঁদকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাই ধর্তব্য। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতার ক্ষেত্রে জমহুরের (সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের) মতকে গ্রহণ করা উচিত এবং যেসব ভূখণ্ডের রাত্রি এক, সেখানকার যে কোথাও চাঁদ দেখা গেলে এবং শরীয়তসম্মত মাধ্যমে অন্যস্থানে সে সংবাদ পৌঁছলে সেখানেও এই চাঁদ দেখা ধর্তব্য হওয়া উচিত। এই মূলনীতি বলার পর তিনি ঘোষণা করেন যে, মিসর সরকারের পক্ষ থেকে কায়রো এবং ইস্কোন্দারিয়ার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রসমূহে এবং কায়রো টাওয়ারে চাঁদ দেখার কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। কায়রো টাওয়ার নীল নদের তীরে সুদৃশ্য একটি মিনার। ৮০ তলা সমান উঁচু। এখান থেকে সম্পূর্ণ কায়রো শহরই শুধু নয়, বরং শহরতলীর অঞ্চলও দেখা যায়। কিন্তু সেদিন কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি। তাছাড়া সৌদি আরব সহ আরো কয়েকটি আরব দেশের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে। সেখানেও চাঁদ দেখা যায়নি। তাই শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবারে প্রথম

রোযা রাখা হবে।

আল্লাহ তাআলার হাজার হাজার শুকরিয়া, পবিত্র হেজাযে এই সফর সমাপ্ত হয়। পবিত্র রমাযানের প্রথম রোযা মক্কা মুকাররমায় রাখি। রমযানের পবিত্র মুহূর্তগুলোতে ওমরা ও যিয়ারতের তাওফীক হয়। মক্কা ও মদীনায় পাঁচদিন অবস্থান করার সৌভাগ্য হয় এবং পুনরায় স্পষ্টভাবে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, এই পৃথিবী ও এর মধ্যে অবস্থিত সকল রূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই রূপ লাবণ্যের সম্মুখে তুচ্ছ, যা পানি ও বৃক্ষলতা শূন্য এই ভূখণ্ডে আল্লাহ পাক গচ্ছিত রেখেছেন। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে আল্লাহর শোকর আরাম-আয়েশের সকল সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। ঋতুও ছিল মনোরম। কিন্তু বাস্তব এই যে, সেখানে একদিনের জন্যও মনের তৃপ্তি লাভ হয়নি। বরং এক অব্যক্ত অন্ধকার অনুভূত হয়। কিন্তু আল্লাহর ঘরের পরিবেশে পৌঁছার পর প্রচণ্ড গরম, রোযা ও ওমরা করার অল্প বিস্তর পরিশ্রম সত্ত্বেও উপলব্ধি হয় যে—

اگر جنت بریں روئے زمیں است
ہمیں است وہمیں است وہمیں است

অর্থ ঃ পৃথিবীর বুকে জান্নাত থেকে থাকলে
তবে তা এখানেই! এখানেই!! এখানেই!!!

ভারত সফর

দারুল উলূম দেওবন্দের শতবার্ষিকী মাহফিল উপলক্ষ্যে
সময়কাল ঃ মার্চ ১৯৮০ ইং

দারুল উলূম দেওবন্দের শতবার্ষিকী মাহফিল

গত মাসে দেওবন্দে দারুল উলূমের সেই অবিস্মরণীয় শতবার্ষিকী এজলাস অনুষ্ঠিত হয়, দীর্ঘদিন ধরে যার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম। সেই এজলাসে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে অধম ভারত সফর করি। প্রায় পুরো একটি মাসই এই সফরে অতিবাহিত হয়।

ভারত ও পাকিস্তান সরকার পরস্পর চুক্তির মাধ্যমে এজলাসে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ সুবিধাসমূহ প্রদান করে। পাকিস্তান সরকার লাহোর থেকে আটারী পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে। আর ভারত সরকার আটারী থেকে দেওবন্দ পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন চালু করে। অত্যন্ত আবেগ ও উদ্দীপনা সহকারে লাহোর থেকে ট্রেনকে বিদায় জানানো হয়। প্রায় সাড়ে আটশ' লোকের বিশাল এক কাফেলা এই ট্রেনে যাত্রা করে। কাফেলায় দেওবন্দের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন বিশিষ্ট আলেম, খতীব, তালিবে ইলম এবং অন্যান্য মুসলমান ছিলেন। সম্মিলিত এই সফরে মতাদর্শের একতা এক অপার্থিব ভাব ও পুলকের জন্ম দেয়। ১৯শে মার্চ ১৯৮০ খৃষ্টাব্দ ঠিক বারটায় ট্রেন লাহোর থেকে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু আটারীতে কাষ্টমস, ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য কাজ থেকে অবসর হতে হতে আছর নামাযের সময় হয়ে যায়। অমৃতসর ষ্টেশনে মাগরিবের নামায আদায় করা হয়। অমৃতসর থেকে দেওবন্দের সফর যদিও সাত আট ঘন্টার অধিক নয়, কিন্তু রাত্রিবেলায় অসময়ে দেওবন্দে পৌছতে হবে বলে ট্রেন এমনভাবে চালানো হয়, যেন ট্রেন পরবর্তী ফজরের পূর্বে দেওবন্দে পৌছতে পারে। বিধায় সারা রাত সফর চলতে থাকে।

সাহরীর সময় যখন নিদ্রা ভঙ্গ হয়, গাড়ী তখন সাহারানপুর রেল ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। দেওবন্দ আর মাত্র আটাশ মাইলের মত দূরে। কিন্তু বর্ণনাতীত তীব্র আবেগ ও অধীর প্রতীক্ষা এই দূরত্বকে চরম ধৈর্য সংকুল বানিয়ে দেয়।

দেওবন্দের সঙ্গে অধমের সম্পর্ক নানাবিধ ও নানাপ্রকারের। আমার জন্মস্থান যদিও দেওবন্দেই, কিন্তু আমার মাত্র ছয় বছর বয়সের সময় হযরত ওয়ালিদ সাহেব সেখান থেকে হিজরত করে পাকিস্তান চলে আসেন। তারপর তের বছর বয়সে একবার দেওবন্দ গিয়েছিলাম, কিন্তু তাও একজন মুসাফির ও মেহমানরূপে। তাই নিজের জন্মস্থানরূপে দেওবন্দের কল্পনা আমার জন্য একটি অস্পষ্ট স্বপ্নের চেয়ে বেশি স্পষ্ট নয়। কিন্তু জন্মভূমির সাথে একজন মানুষের যে আকর্ষণ কুদরত রেখে দিয়েছেন, তার বিস্ময়কর প্রকাশ এমন মুহূর্তগুলোতেই হয়ে থাকে। বাহ্যত ছয় বছর বয়সের একটি শিশুর জন্মভূমি ও তার ভালবাসার কোনরূপ অনুভূতিই হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এটি একটি সহজাত বিষয় যে, আজ ত্রিশ বছর পরও দেওবন্দের নাম শ্রবণ করলে অন্তরে তার ভালবাসার ঝর্ণা উৎসারিত হতে থাকে। তাছাড়া দেওবন্দে আজও এমন আপনজন ও আত্মীয়–স্বজন রয়েছেন, যাঁদের নিখাদ ভালবাসা ও একনিষ্ঠ সম্পর্কও চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে। আর সবচে' বড় কথা হলো, দেওবন্দ অধমের জন্য জন্মস্থান আর আপনজনদের শহরই শুধু নয়, বরং তা হেদায়েতের বিশাল প্রস্রবণের এমন মূল উৎস, যার ফয়েজ হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও নাজানি আমার মত কত পিপাসার্তকে পরিতৃপ্ত করছে।

এটি এমন সব ওলী আল্লাহর ভূখণ্ড, যাঁরা নিজেদের পূতপবিত্র চরিত দ্বারা ইসলামের প্রথম যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমার মত তালিবে ইলেমের দ্বীন ও দুনিয়ার যে সকল নেয়ামত লাভ হয়েছে, তা তাদেরই জুতার বরকতে লাভ হয়েছে। এটি সে সকল খোদা প্রেমিক মুজাহিদদের ছাউনি, যাঁরা পেটে পাথর বেঁধে সকল প্রকার তাগুত ও বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং নিজেদের রক্ত ও ঘাম ঝরিয়ে উপমহাদেশে মুসলমানদের ইজ্জত ও আযাদীর প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। মোটকথা, এটি সেসব পবিত্র আত্মার আবাসভূমি, যাঁরা এই আখেরী শতাব্দীতে দ্বীনের মুজাদ্দিদ প্রমাণিত হয়েছেন, যাঁরা এই শেষ যুগে কুরআন ও সুন্নাহর ইলমী ও আমলী বাস্তবরূপ পেশ করে এ কথা প্রমাণিত করেছেন যে, আল্লাহর মনোনিত এই দ্বীন আমলকারীদের জন্য

আজও ঐশ্বর্যপূর্ণ রয়েছে। সেই পবিত্র আত্মাগণ দেওবন্দের মাটিতে যেই হৃদয় কাড়া শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং তার ভিত্তিতে ছোট এই জনপদের সঙ্গে ভক্তি ও ভালবাসার যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা রক্ত ও বংশের যে কোন সম্পর্ক থেকে অনেক বেশি উন্নত ও উঁচু।

গাড়ী সাহারানপুর থেকে দেওবন্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আর আমার হৃদয়ে আবেগ ও কল্পনার এক তরঙ্গ–সংঘাত চলছিল। স্মৃতিপটে অতীতের ইতিহাসের অসংখ্য পাতা দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। চোখের সম্মুখে অতীতকালের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দৌড়ে চলছিল। নিজের পুরাতন জন্মভূমি দেখার আগ্রহ, প্রিয়জন ও বন্ধু–বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা, আর সবচে' বেশি আকাবিরে ওলামায়ে দেওবন্দের স্মৃতিসমূহ প্রত্যক্ষ করার অস্থিরতা, এমনি নাজানা আরো কত আবেগ ও উচ্ছাসের কাফেলা ট্রেনের চেয়ে অধিক দ্রুত দেওবন্দের দিকে দৌড়াচ্ছিল। অবশেষে দিগন্তে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বিদ্যুতের আলো দৃষ্টিগোচর হলো। দেওবন্দের আশেপাশে যেহেতু এমন ঝলমলে কোন জনবসতি নেই তাই আমরা নিশ্চিত হই যে, এটি শতবার্ষিকী উৎসবের সেই ক্যাম্প, যা অস্থায়ীভাবে দেওবন্দের বসতীর বাইরে তৈরী করা হয়েছে। মূলত সেখান থেকে সমগ্র বিশ্বে আধ্যাত্মিক আলো বিস্তার লাভ করার পর দেওবন্দের এই বাহ্যিক জাঁকজমক প্রদর্শনের কখনো কোন প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।

অল্প পরেই যখন ভোর রাতের অন্ধকার ঊষার আলোয় রূপান্তরিত হল, তখন রেলগাড়ী ক্যাম্পের সামনে এসে থেমে গেল। সেখানে 'দারুল উলূম হল্ট' (মঞ্জিল) লেখা একটি সাইনবোর্ড লাগানো ছিল। প্লাটফর্মটি রেলওয়ের পক্ষ থেকে এজলাসের উদ্দেশ্যে আগত স্পেশাল ট্রেনের জন্য অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এজলাস–ক্যাম্প এখান থেকে শুরু হয়ে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দূরে চলে গেছে। আমরা এখানে নেমে ফজর নামায আদায় করি। দেওবন্দের আসল ষ্টেশন এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। মূল ষ্টেশনে গিয়ে সকলের নামার সিদ্ধান্ত হয়। তাই নামাযান্তে ট্রেন পুনরায় চলতে আরম্ভ করে এবং কয়েক মিনিটে আমাদেরকে দেওবন্দ পৌঁছে দেয়।

দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর বিচ্ছিন্ন প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাত হলো

অনেক নিকটাত্মীয়ের সাথে এই প্রথমবার মুলাকাত হলো। এমন অনেকের সাথেও দেখা হলো, কালের বিবর্তনে যাদেরকে চেনাও কঠিন ছিল। মোটকথা, আজকের দিনটি প্রিয়জন ও বন্ধু–বান্ধবের সাথে দেখা সাক্ষাত এবং দেওবন্দের গলি ও বাড়ীসমূহের মাঝে পুরাতন স্মৃতি স্মরণ করতেই ব্যয় হলো। আমি শ্রদ্ধেয় চাচাত ভাই জনাব মাওলানা খুরশীদ আলম সাহেবের নিকট অবস্থান করি। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের বিশিষ্ট উস্তাদদের অন্যতম এবং শতবার্ষিকী উৎসবের সেই আটজন ব্যবস্থাপকেরও অন্যতম, হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব মূল সভা চলাকালীন বিশেষভাবে যাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মেহমানদের ক্যাম্পিং প্যাণ্ডেল, ষ্টেজ ও ষ্টলের জটিলতম ব্যবস্থাপনা তাদেরই দিন রাতের প্রাণান্তকর চেষ্টার ফল। তার বাড়ী আমাদের দাদাজানের মহল্লাতে এবং তার বাড়ীর সাথেই আমাদের সেই বাড়ীও রয়েছে, যা এক সময় আমাদের ছিল।

আমরা আমাদের অবস্থানস্থল থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথম দারুল উলূম দেওবন্দে যাই। সেখানে ঈদের মত এক পরিবেশ বিরাজ করছিল। প্রতি মুহূর্তে মেহমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব (রহঃ), মুহতামিম দারুল উলূম–এর খেদমতে হাজির হই। আমরা ভেবেছিলাম এ সময় তাঁর উপর এই বিশাল এজলাসের দায়িত্ব এবং তার ব্যবস্থাপনার বিরাট বোঝা চেপে আছে। কিন্তু তার নিকট গিয়ে দেখতে পাই যে, তিনি নিজ আসনে অত্যন্ত প্রশান্ত মনে বসে আছেন। স্বভাবমাফিক হৃদয়গ্রাহী ঈষৎ হাসি সহকারে প্রত্যেক আগন্তুককে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং এমনভাবে কথোপকথনে লিপ্ত আছেন, যেন নতুন কোন বিষয়েরই সম্মুখীন হননি। তিনি বললেন, মন তো চায়, যত মেহমান বাহির থেকে আগমন করেছেন, তাদের প্রত্যেকের অবস্থান কেন্দ্রে গিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাই। কিন্তু দুই তিন দিন ধরে সামান্য জ্বর হয়েছে, তাই অপারগ হয়ে গেছি। অধম এজলাসের ব্যবস্থাপনার কথা উঠালে তিনি বললেন, ভাই! আমি তো আমার সকল সাথীকে বলে দিয়েছি যে, আপনাদের সামর্থ্যে যতটুকু আছে, ততটুকু ব্যবস্থাপনা আপনারা করুন। আর আল্লাহর উপর ভরসা

রাখুন। ইনশাআল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকেই সবকিছু ঠিকঠাক মত সম্পন্ন হয়ে যাবে।

দারুল উলূমের মাটি

দারুল উলূমের প্রতিটি কোণার পৃথক ইতিহাস রয়েছে, মুলছিরীর (বকুল বৃক্ষের) এলাকায় প্রবেশ করতেই সেসব পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের শ্বাস–প্রশ্বাসের সুবাসে সেখানকার পরিবেশ আজও আচ্ছন্ন মনে হলো। পূর্ব দিকে আজও সেই কূপ ইলম পিপাসুদের পরিতৃপ্ত করছে, যার সম্পর্কে হযরত মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেবের মত আল্লাহর ওলী স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, কূপটি দুধে পরিপূর্ণ রয়েছে, আর তার চারপাশে মারেফাতের তৃষাতুর ব্যক্তিবর্গ ভীড় করেছে। রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই কূপ থেকে পরিতৃপ্ত করছেন। এ এলাকার ঠিক মাঝখানে মূলছিরীর (বকুল) সেই বৃক্ষ রয়েছে, যার ভাবাবেগপূর্ণ ছায়ায় নাজানি কত আলেম ও ওলী সবকের তাকরার করেছেন। এর পশ্চিমে রয়েছে সেই দারুল হাদীস, যা শতাব্দীর সর্বাধিক গর্বিত মুহাদ্দিসীনেকেরাম জন্ম দিয়েছে এবং তার উপর দারুত তাফসীরের সেই সুউচ্চ গম্বুজ, যার মধ্যে বিগত শতাব্দীর মহান মুফাচ্ছিরীন তৈরী হয়েছেন। মুলছিরীর (বকুল) এলাকার উত্তর দেওয়ালে সেই কক্ষ রয়েছে, যা বহুদিন দারুল ইফতারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অধমের ওয়ালিদ মাজিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) বহু বছর যাবত এখানেই ফতোয়া লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এভাবে এখান থেকে 'ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম'–এর সেই বিশাল ভাণ্ডার তৈরী হয়েছে, অতিকষ্টে যার বিশতম খণ্ড আজ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে। মোটকথা, এই এলাকা থেকে শুরু করে বাবুজ জাহির পর্যন্ত এখানকার প্রতি ইঞ্চি জায়গা এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মানবদের স্মৃতি। এর প্রতিটি কোণার ইতিহাসের উপর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রস্তুত হতে পারে। অতীতের কল্পনার এক জগত হৃদয়ে ধারণ করে কয়েক ঘন্টা এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশ ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি। একেকটি স্মৃতি প্রত্যক্ষ করে

মুতানাব্বীর এই কবিতা হৃদয়পটে ভেসে উঠছিল—

بليت بلى الاطلال ان لم اقف بها

وقوف شحيح ضاع فى الترب حاتمه

অর্থ ঃ যদি আমি তার পাশে সেই কৃপণের মত না দাঁড়াই, যার আংটি মাটিতে হারিয়ে গেছে—তাহলে আমি রক্তপণ ছেড়ে দেওয়ার মতই ক্ষতিগ্রস্ত হব।

মাকবারায়ে কাসেমী

আসর নামাযের পর আমরা কয়েকজন কবরস্থানে যাই। কবরস্থানটির নাম 'মাকবারায়ে কাসেমী'। সর্বপ্রথম হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানতুবী সাহেব (রহঃ)এর মাযারে হাযির হই। দারুল উলূম তাঁরই লাগানো চারা, যার পাতা–পল্লব ও ফল আজ সমগ্র আলমে ইসলামে বিস্তার লাভ করেছে। আজকে এই মাযারে দারুল উলূমের ফয়েজপ্রাপ্তদের এত ভীড় ছিল যে, সম্ভবত ইতিপূর্বে কখনো এরূপ হয়নি। তাঁর পদপার্শ্বে বিশিষ্ট দুটি কবর দেখা যাচ্ছিল। একটি শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু এর কবর। যিনি দারুল উলূমের প্রথমে তালিবে ইলম, তারপর মুদাররিছ, সদরে মুদাররিছ, শাইখুল হাদীস সবকিছুই ছিলেন এবং দারুল উলূমের চাটাইতে বসেই তিনি ভারতের স্বাধীনতার সেই আন্তর্জাতিক আন্দোলন পরিচালনা করেন যা 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধ। দেখতে হাড্ডিসর্বস্ব কিন্তু কুফুর ও বাতিলের জন্য এক দুর্দমনীয় পাষাণ।

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

অর্থ ঃ পুষ্প হৃদয় শীতলকারী সেই শিশির, কাঁপিয়ে তোলে যে তুফান হৃদয় নদীর।

তাঁর সারাটি জীবন জিহাদ ও জিহাদের প্রস্তুতিতে অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর সময় চেহারায় মলিনতা দেখে কেউ কেউ ধারণা করল, হয়ত মৃত্যুর

চিন্তা তাঁকে মলিন করে দিয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ তীব্র বাসনা ছিল কোন রণক্ষেত্রে মৃত্যু হবে। মাথা কেটে এক জায়গায় ছিটকে পড়বে, দেহ আরেক জায়গায়। দুঃখ হচ্ছে আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে মারা যাচ্ছি। ইলম ও আমল তাকওয়া–তাহারাত, শ্রম–সাধনা, বিনয় ও নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের এই মূর্তপ্রতীক দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ফল, যিনি এখানে একটি কাঁচা কবরের তলে বিশ্রাম করছেন। ঠিক তাঁর বরাবরে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ সাহেব মাদানী কুদ্দিসা সিররুহুর মাযার। হযরত মাদানী (রহঃ), হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)এর সেসব উৎসর্গপ্রাণ সহচরদের অন্যতম ছিলেন, যিনি নিজের শায়েখের সঙ্গে বন্দীত্বের কষ্ট বরণ করেছেন এবং তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার কাজে জানকে জান মনে করেননি। অধমের ওয়ালিদ মাজিদ (রহঃ) আমার দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন সাহেব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করতেন যে, যখন হযরত মাদানী (রহঃ) আরব ও আজমের শায়েখ, সে সময় হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)এর বাড়ীতে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল। তখন আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, হযরত মাদানী সাহেব (রহঃ) নিজের মাথায় পানির মটকা উঠিয়ে শায়েখের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছেন। সারাটি জীবন তিনি যেভাবে নিজের শায়েখের খিদমতে ও সাহচর্যে কাটিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পরেও তাঁকে তাঁর শায়েখের পাশে স্থান করে দিয়েছেন।

এঁদের আশেপাশেই হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু, মুফতীয়ে আজম দারুল উলূম, হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু, মুহতামিম দারুল উলূম, শাইখুল আদব হযরত মাওলানা এজাজ আলী সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু ও আরো নাজানি ইলম ও আমলের কত পর্বত সমাধিস্থ আছেন। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) ও হযরত মাদানী (রহঃ)এর পায়ের দিকে একটু পশ্চিমে সরে গিয়ে অধমের দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন সাহেব (রহঃ) কুদ্দিসা সিররুহুর মাযার। তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু–এর সহপাঠী এবং হযরত

শাইখুল হিন্দ (রহঃ)এর সাগরেদ ছিলেন। সর্ব বিষয়ে ও সর্ব শাস্ত্রে উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সারাটি জীবন দারুল উলূমের ফার্সি ও অংক বিভাগের উস্তাদ হিসেবে কাটিয়েছেন এবং দেওবন্দের খুব কম পরিবারই এমন আছে, যার কয়েক পুরুষ তার কাছে পড়েনি। অধমের ওয়ালিদ মাজিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) তার রচিত 'মেরে ওয়ালিদ মাজিদ (রহঃ)' পুস্তিকায় তাঁর সম্পর্কে অনেকটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এই কবরের উত্তরে কিছু দূরে হযরত হাজী আবেদ হুসাইন সাহেব (রহঃ)এর মাযার। যিনি দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন এবং বেলায়েত ও তাকওয়ার এমন উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যা সমসাময়িক আলেমদের জন্যও ঈর্ষণীয় ছিল।

কবরস্থানের উত্তর পশ্চিমে প্রায় দুই ফার্লং (৪৪০ গজ) দূরে দেওবন্দের ঈদগাহ। ঈদগাহের দক্ষিণ পাশে ইমামুল আছর হযরত সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর মাযার। এ কথার দাবীতে হয়ত কোন অতিরঞ্জন নাই যে, হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) এই শতাব্দীতে হাদীস শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় ইমাম ছিলেন। শুধু ভারতের আলেমগণই নন বরং আরব বিশ্বের গবেষক আলেমগণও একথা স্বীকার করেছেন। স্মরণশক্তি ও বিস্তর অধ্যয়নে তাঁর কোন তুলনা নিকট অতীতে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া, হযরত (রহঃ)এর তাকরীরে বুখারী ও তাকরীরে তিরমিযী প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যাঁরা তার দরসে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন তাদের বক্তব্য হলো, এই তাকরীরগুলোতে হযরত শাহ সাহেব (রহঃ)এর পাঠদান পদ্ধতির অতি কষ্টে পঁচিশ শতাংশ ঝলক এসেছে মাত্র।

মোটকথা এই কবরস্থানে শায়িত প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব এমন যে, তাঁদের আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। আলহামদুলিল্লাহ অনেক বুযুর্গের জীবন চরিত প্রকাশিতও হয়েছে। হায়! আল্লাহর কোন বান্দা যদি 'মাকবারায়ে কাসেমী' নামে কোন গ্রন্থ রচনা করত! যার মধ্যে এসব বুযুর্গের মাযার চিহ্নিত হত এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোচনাও সন্নিবেশিত হত।

মাহফিলের চিত্র

আগামী দিন যেখানে সদসালা এজলাস (শতবার্ষিকী মাহফিল) শুরু হবে, মাগরিব নামাযের পর সেই দিকে যাই। দেওবন্দ শহরে এত বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার মত জায়গা জোগাড় হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং করাচী থাকতে আমরা যখন কল্পনা করতাম যে, দেওবন্দে এত বড় সমাবেশ কোথায় এবং কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে, তখন তা কল্পনা করতেও আমরা ভয় পেয়ে যেতাম। কিন্তু তাদের সাহসকে ধন্যবাদ দিতে হয়, যারা দেওবন্দের মত ছোট জায়গায় যার বসতি অতিকষ্টে ৬০/৭০ হাজার হবে এবং যার যাবতীয় উপাত্ত-উপাদান গ্রামীণ আন্দাজের, সেখানে এত বড় সমাবেশের ব্যবস্থা করেছেন। সমাবেশের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপকগণ ঈদগাহের ওপারে অনেক লম্বা ও চওড়া আয়তনের জমি খালি করিয়েছেন এবং জমিকে এমনভাবে সমতল করেছেন যেন এই জায়গা সর্বদা সমাবেশ অনুষ্ঠিত করার জন্যই বানানো হয়েছে। সমাবেশ স্থলের পশ্চিমপ্রান্ত রেল লাইন থেকে শুরু হয়েছে। আর পূর্বপ্রান্ত সেখান থেকে দুই আড়াই মাইল দূরের বাগান পর্যন্ত চলে গেছে। উত্তরে জিটি রোড এবং দক্ষিণে ঈদগাহ পর্যন্ত তার সীমানা।

সমাবেশ স্থলের পূর্বাংশে বাহির থেকে আগমনকারী মেহমানদের অবস্থানের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছে। প্রত্যেক এলাকার মেহমানদের জন্য পৃথক ক্যাম্প করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্যাম্পে ঐ এলাকার নামে বোর্ড বসানো হয়েছে। পানির জন্য কিছু দূর পর পর তিনশত হ্যাণ্ড পাম্প বসানো হয়েছে। উত্তরাংশে পানাহার সামগ্রীর ষ্টল। পশ্চিমে সমাবেশ স্থল। সেখানে শামিয়ানার নীচে তিন লক্ষ লোকের বসার ব্যবস্থা এবং এই পরিমাণ জায়গাই শামিয়ানার বাইরে উন্মুক্ত ময়দান হিসেবে রাখা হয়েছে। এগুলোর পিছনে রয়েছে থাকার ক্যাম্প। সমাবেশ স্থলের পশ্চিম প্রান্তে পাকা ইট দ্বারা অত্যন্ত জাকজমক মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। মঞ্চটি তিনশ' ফুট লম্বা, দেড়শ ফুট চওড়া এবং দশ ফুট উঁচু। মঞ্চে বিশেষ মেহমানদের জন্য কার্পেট এবং চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। এত বিশাল বিস্তৃত সমাবেশ হয়েছিল যে, শামিয়ানার পূর্ব প্রান্তে দাঁড়িয়ে এত বৃহৎ মঞ্চের উপর বসা লোকগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। শামিয়ানার মাঝে এত

নিপুণভাবে বাঁশের খুঁটি বসানো হয়েছে যে, আমি ইতিপূর্বে বাঁশের খুঁটির এমন নিখুঁত ও সমদূরত্বের ব্যবহার কখনো দেখিনি। শামিয়ানার মাঝে মঞ্চে পৌঁছার জন্য পাঁচটি প্রশস্ত পথ রাখা হয়েছে। পথের মধ্যে দ্বিমুখী যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সমাবেশ চলাকালে এ সবগুলো পথও মানুষ দ্বারা এভাবে পূর্ণ ছিল যে, সেখান দিয়ে অতিক্রম করা তো দূরের কথা তিল ধারণের স্থানও ছিল না।

সমাবেশস্থলেই জুমুআর নামায হবে। জুমুআর পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। আমরা যখন জুমুআর আগে প্যাণ্ডেলের দিকে যাচ্ছিলাম তখন মানুষের এক সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। এমন মনে হচ্ছিল যেন মাটি ফুঁড়ে মানুষ উতলে উঠছে। প্যাণ্ডেলের উত্তর দিক দিয়ে সমান্তরালে জিটি রোড এগিয়ে গেছে, তাতে অন্তহীন বাস ও অন্যান্য গাড়ীর সারি। সেগুলোর ছাদের উপরও মানুষ বসে আছে। ওদিকে প্রতি ঘন্টায় ভারতের চতুর্দিক থেকে স্পেশাল ট্রেন ষ্টেশনে এসে থামছে। মীনা ও আরাফার পর এমন জাকজমকপূর্ণ দৃশ্য আমি আর কোথাও দেখিনি। হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব জুমুআর নামাযের ইমামতি করেন। তিনি ছিলেন মঞ্চে আর আমরা জায়গা পেয়েছিলাম অবস্থান ক্যাম্পগুলোর ধারে। অথচ আমাদের পিছনেও দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত মানুষ আর মানুষ দেখা যাচ্ছিল।

নামাযান্তে আমরা কিভাবে যে ষ্টেজে পৌঁছলাম তা বলতেই পারব না। তখন জলসার কাজ শুরু হচ্ছিল। মঞ্চে পৌঁছে চতুর্দিকে তাকালাম। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত শুধু মানুষের মাথাই দেখা যাচ্ছিল। পুরো প্যাণ্ডেল জনসমুদ্রে এমনভাবে ভরা ছিল যে, শরীর ঘোরানোও অসম্ভব ছিল। মাঝখানের রাস্তাগুলোতেও মানুষ এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে, না সম্মুখে যাওয়ার সুযোগ ছিল, না পিছনে ফেরার। বসার তো প্রশ্নই আসে না। অধম লেখকের বয়স তো খুব কমই, অনেক বয়স্ক এবং দুনিয়াঘোরা লোকেরাও বলছিলেন যে, তারা জীবনে কখনো কোথাও এত বড় সমাবেশ দেখেননি।

আলমে ইসলামের খ্যাতনামা কারী শায়েখ আবদুল বাছেত আবদুস সামাদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু

হয়। তারপর হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ) তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে দারুল উলূমের লক্ষ্য, ইতিহাস ও তার শত বছরের অবদানের উপর আলোকপাত করেন।

এই সমাবেশে ইন্দিরা গান্ধীর (প্রধানমন্ত্রী, ভারত) অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে এক দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু প্রথমত এই সংবাদটি নিতান্ত ভ্রান্ত এবং প্ররোচণামূলক যে, তার দ্বারা অধিবেশন শুরু করা হয়। বাস্তব ঘটনা এই যে, সে একজন সাধারণ বক্তা হিসেবে স্বউদ্যোগে সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছে। দারুল উলূমের ব্যবস্থাপকগণের ইচ্ছায় তার উপস্থিতি হয়নি। বরং তার উপস্থিতি তার নিজের পীড়াপীড়িতেই হয়েছে। দারুল উলূম কোন রাষ্ট্রপ্রধানকেই সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দেয়নি। কিন্তু সম্ভবত এই বিশাল সমাবেশ দ্বারা নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধী সাহেবা নিজের থেকে সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করে। তার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান না করার উপর আপত্তি করতে গিয়ে একথা ভুললে চলবে না যে, ভারতে মুসলমানদের অবস্থানকে কোনভাবেই পাকিস্তানের সাথে তুলনা করা যায় না। যাই হোক, এই সমাবেশে একজন অমুসলিম নারীর ভাষণ দান যদিও তা অপারগ অবস্থাতেই হোক না কেন অবশ্যই দুঃখজনক একটি ঘটনা, যা এই পবিত্র সমাবেশের নূর ও বরকতে এবং তার নির্মল পরিবেশে আবর্জনার সৃষ্টি করেছে। আর আশ্চর্যের কিছু নয় যে, এই দুঃখজনক ঘটনার বরকতহীনতার কারণেই সমাবেশের যে অধিবেশনে সে অংশগ্রহণ করেছিল তাতে সমাবেশের একটি অংশ বেশির ভাগ সময়ই নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। আর সেই অধিবেশনের পুরা সময়টিতে সে অংশের গোলযোগ এত বেশি ছিল যে, তখন ভাষণ শোনাও কঠিন হয়ে পড়ে।

দুঃখজনক এই দিকটি বাদ দিলে এই শতবার্ষিকী মাহফিলের পরবর্তী প্রত্যেকটি অধিবেশন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়। তিনদিনের একটানা এই অধিবেশনে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর এই পরিমাণ দৃঢ়তা ও অবিচলতার সঙ্গে বসে থাকা যে, একটি অধিবেশনেও প্যাণ্ডেলের মধ্যে সামান্য শূন্যতাও চোখে পড়েনি, যা

সম্মেলনের ইতিহাসে এক বিরল ও নজিরবিহীন ঘটনা। বলা বাহুল্য যে, এত বড় প্যাণ্ডেলের মধ্যে পাখা ও পানি পান করানোর ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু দিনের বেলা প্রচণ্ড রোদ সত্ত্বেও সমাবেশের লোকেরা যে দৃঢ়তার সঙ্গে জমে থাকে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর।

এই সমাবেশকালে দেওবন্দে উপমহাদেশের সেরা সেরা আলেম, সালেহ ও বুযুর্গগণ উপস্থিত ছিলেন। বরং আরব বিশ্বের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও কলামিষ্ট এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূতগণও শরীক ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনদিনের সমাবেশে এদের সকলের ভাষণ ও বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। উপরন্তু এ সমাবেশে দারুল উলূমের দশ সহস্রাধিক শিক্ষা সমাপনকারীর দাস্তারবন্দীও করা হবে। তারপরও সমাবেশ চলাকালে তাদের অনেকেরই বক্তৃতা, ভাষণ ও উপদেশ দ্বারা শ্রোতামণ্ডলী উপকৃত হতে থাকেন। আর যাদের ভাষণসমূহ অবিস্মরণীয় জ্ঞান সমৃদ্ধ ছিল, তাদের মধ্যে হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব (রহঃ) মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ এবং হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব (রহঃ)এর ভাষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দারুল উলূমের ফুযালা (শিক্ষা সমাপনকারীদের) দস্তারবন্দী (পাগড়ী প্রদান) ছিল এ সমাবেশের আসল উদ্দেশ্য। দস্তারবন্দীর এই জলসা প্রায় সত্তর বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বিধায় এই দীর্ঘ সময়ে এখান থেকে শিক্ষা সমাপনকারী বিরাট সংখ্যক আলেম তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। বাকী যারা জীবিত আছেন এবং এখানে আসতে পেরেছেন তাদের সংখ্যাও ছিল প্রায় দশ হাজার। যদি সাধারণ নিয়মমাফিক সকলের নিয়মতান্ত্রিক দস্তারবন্দী করা হত, তাহলে তিনদিনের এই সমাবেশের অন্যান্য সকল প্রোগ্রাম বাতিল করা হলেও হয়তো সকলের হক আদায় করা সম্ভব হত না। বিধায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় যে, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দারুল উলূমে শিক্ষা সমাপনকারী যাঁরা এখানে আসতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে ইলম ও আমলে সর্বজন স্বীকৃত মাকামের অধিকারীদেরকে দস্তারবন্দীর জন্য নির্বাচিত করা হয়। অবশিষ্টদের মধ্যে হাতে হাতে পাগড়ী বিতরণ করা হয়।

দস্তারবন্দীর দৃশ্যটিও বড় বিস্ময়কর, বিরল ও প্রভাবপূর্ণ ছিল। যাঁদের দস্তারবন্দী করা হয় তাদের মধ্যে হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (কুদ্দিসা সিররুহুর) নাতী জনাব ভাই সাঈদ সাহেবও শামিল ছিলেন। তিনি বর্তমানে দারুল উলূমের বুযুর্গতম ব্যক্তিত্ব। হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ)কেও তিনিই পাগড়ী প্রদান করেন। এছাড়া হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ) মদীনা তায়্যেবা থেকে চারটি বিশেষ পাগড়ী প্রেরণ করেন। তার একটি হযরত মুহতামিম সাহেব (রহঃ)এর জন্য, একটি মাওলানা মুহাম্মদ ছালেম সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ)এর জন্য, একটি মাওলানা আসাদ মাদানী সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ)এর জন্য আর চতুর্থটি সম্ভবত হযরত ভাই সাঈদ সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ)এর জন্য ছিল।

সম্মেলন শেষে হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রহমানী সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ)এর প্রচেষ্টায় কয়েকটি কর্মসূচীও গৃহীত হয়। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি কর্মসূচী আফগানিস্তানে রাশিয়ার আক্রমণের বিপক্ষে এবং আফগান মুজাহিদদের সহযোগিতামূলক ছিল। ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত একটি সমাবেশের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং নির্ভীক কর্মসূচী ছিল। কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার পর ২৩শে মার্চ রবিবারে দুপুর একটার কাছাকাছি সময়ে হযরত মুহতামিম সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ)এর দুআর মাধ্যমে এই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

পৃথিবীতে অনেক সম্মেলনই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে যে আবেগ, উচ্ছাস, মুহাব্বত ও ভালবাসা নিয়ে এত বিরাট সংখ্যক মুসলমান এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন, নিঃসন্দেহে তা উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। এমন অনেক মাজুর লোক, যারা অন্যের সহযোগিতা ছাড়া এক কদমও চলতে পারে না, তারা নাজানি কত কষ্ট করে সম্মেলনে আসেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাতে শরীক থাকেন। দেওবন্দের জনসাধারণও সম্মেলনে আগমনকারী মেহমানদের জন্য সাধারণ দস্তরখান বিছিয়ে রেখেছিলেন যে, সেখানে মেহমানরা আসবে আর খানায় শরীক হতে থাকবে।

এত বড় সমাবেশের সঠিক অনুমান করা মুশকিল তো বটেই, উপরন্তু এতে অতিরঞ্জনও হয়ে থাকে। কিন্তু আমি অধমের সতর্ক অনুমান এই যে, এই সম্মেলনে উপস্থিত লোকের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ লাখ অবশ্যই হবে। দেওবন্দের মত ছোট জনপদে, যার জনবসতি খুব বেশি হলে ৬০/৭০ হাজার, সেখানে একসঙ্গে ১৫/২০ লাখ লোক একত্র হলে খাদ্য ও পানিয়ের অভাব দেখা দেওয়া, রোগ ছড়িয়ে পড়া এবং দুর্গন্ধ ও আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ার মারাত্মক আশংকা ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ এবং দেওবন্দের আকাবিরদের দুআর বরকতে এত বড় সমাবেশের একজনেরও খাদ্য বা পানীয় না পাওয়ার অভিযোগ শোনা যায়নি। কোনরূপ আবর্জনা বা সামান্যতম দুর্গন্ধও অনুভব হয়নি। ঝগড়াঝাটিও দেখা দেয়নি এবং উল্লেখযোগ্য কোন দুর্ঘটনাও ঘটেনি। বিশাল এই মজমা তিন দিন পর সম্পূর্ণ কল্যাণ, নিরাপত্তা, ধৈর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে সমাপ্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

উপমহাদেশের লোকেরা তো বড় বড় সমাবেশ ও সম্মেলনে অভ্যস্ত। কিন্তু আরব দেশে এ ধরনের সভা সমাবেশের খুব একটা প্রচলন নেই, ফলে আরব মেহমানরা এত বিশাল সমাবেশ দেখে হতবিহ্বল হয়ে যায়। অনেকেই অত্যন্ত আবেগ সহকারে বলেন যে, মিনা ও আরাফা ছাড়া এত বড় সমাবেশ আমরা জীবনেও দেখিনি।

আল্লাহ পাক দেওবন্দের মাটিতে ইসলাম ও মুসলমানদের এমন শান শওকত দেখিয়ে দেন, যা দেখে অমুসলিমরাও বিস্ময়াভিভূত হয়। বিশেষভাবে ভারতের অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সম্মেলন মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর ও সাহস বর্ধক হবে, ইনশাআল্লাহ।

সদসালা এজলাস (শতবার্ষিকী মাহফিল) চলাকালে দারুল উলূমের দারুল হাদীসে একটি বিশেষ আলোচনা মজলিসেরও ব্যবস্থা করা হয়। এই আলোচনা মজলিসের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক ছিল। অর্থাৎ 'ধর্মীয় মাদ্রাসা ও বর্তমান যুগে তার দায়িত্ব'। এর অধীনে মাদ্রাসাসমূহের নিসাবে তালিম (পাঠ্যসূচী) এর বিষয়টিও ছিল। এজন্য দুটি অধিবেশন করা হয়। প্রথম অধিবেশনের সভাপতি মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবার আবাদী ছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশন আলমে ইসলামের

বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ)এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই দ্বিতীয় অধিবেশনে পাকিস্তান থেকে আমি অধম ও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মাওলানা সামিউল হক সাহেব (সম্পাদক, মাসিক আল হক, আকোড়াখটক) মাদ্রাসাসমূহের নেসাব ও নেজামে তালীম (পাঠ্যসূচী ও শিক্ষা ব্যবস্থা) সংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ করি। আলোচনার বিষয়বস্তু যদিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু সদসালা এজলাসের বিশাল সমাবেশের কারণে দ্বীনি মাদ্রাসার খুব কম আকাবির এতে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন এবং বড় সমাবেশের অবশ্যম্ভাবী ব্যস্ততার কারণে এই আলোচনা অনুষ্ঠানে যথাযোগ্য বেশি সময় ও মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তারপরও এতে অতি মূল্যবান কতগুলো প্রবন্ধ পেশ করা হয়। এখন তার মধ্য থেকে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মাওলানা বুরহান উদ্দীন সাহেব সাম্ভলীর প্রবন্ধ বিশেষভাবে মনে আছে। তা অধমকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ) যে ভাষণ দান করেন, নিঃসন্দেহে তা আলোচনা অনুষ্ঠানের সারাংশ এবং তাকে মাওলানার জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির রাজকর্ম বলা উচিত।

সম্মেলনের আরেকটি বিরাট ফায়দা এই হয়েছে যে, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের সে সকল দ্বীনের খাদেম, যাঁরা দূর থেকে পরস্পরের ব্যাপারে শুনে আসছিলেন এবং তাদের সম্পর্কে পড়ে আসছিলেন কিন্তু বাহ্যত তাঁদের সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, এই মুবারক সমাবেশের বদৌলতে তাঁরা পরস্পর মিলিত হওয়ার ও মত বিনিময় করার সুযোগ পান এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠ হন।

অধম গত মাসের (আল-বালাগ-এর) সম্পাদকীয়তেও লিখেছিলাম যে, দারুল উলূম দেওবন্দের আকবিরগণ কখনই মেলা, উৎসব ও জশনে-জুলুশের প্রবক্তা ছিলেন না। তাঁরা সর্বদাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের খেদমত করেন এবং সুখ্যাতি ও লৌকিকতা থেকে বিরত থাকেন। এই সদসালা এজলাসও কোন জশন বা মেলা ছিল না। তাকে 'জশনে সদসালা' নাম দেওয়াও ভুল। কেননা দারুল উলূমের পক্ষ

থেকে এর নাম 'জশনে সদসালা' নয় বরং 'এজলাসে সদসালা' নির্ধারণ করা হয় এবং এতদসংক্রান্ত দারুল উলূমের পক্ষ থেকে যেই লেখা প্রকাশ করা হয়, তাতে একে এজলাসে সদসালাই বলা হয়েছে। 'জশনে সদসালা' শব্দ বাদ দিয়ে এজলাসে সদসালা শব্দ গ্রহণ করা শুধু আকস্মিক কোন বিষয় নয়, বরং বিচার বিবেচনা করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেন সাধারণ জশনের উৎসবের মত একেও একটি জশন (উৎসব) মনে না করা হয়। বরং প্রকৃতপক্ষে এটি দস্তারবন্দীর একটি জলসা ছিল। যা প্রায় একশত বছর পরে অনুষ্ঠিত হয়, ফলে তা এত বিশাল সমাবেশের রূপ ধারণ করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সম্মেলন দ্বারা মুসলমানদের যেই শান শওকতের প্রকাশ পেয়েছে, দারুল উলূমের যেই ফলাফল লোকেরা স্বচক্ষে দেখেছে, তাঁরা আকাবিরে দেওবন্দের ঈমান উদ্দীপক যেই আলোচনা শুনতে পেরেছে এবং এতে করে যে নতুন সাহস ও উদ্দীপনা অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে তা এই সম্মেলনের বিরাট অর্জন।

শতবার্ষিকী মাহফিলের শিক্ষা

কিন্তু যারা আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তাদের দায়িত্ব সম্মেলনের এসব উপকারিতার কারণে গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করেই শেষ হয়ে যায় না, বরং আমাদের জন্য এটি ভাবার বিষয় যে, যেই আকাবিরদের নামে আমরা এমন নজিরবিহীন সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার যোগ্য হয়েছি, তাঁদের মিশন কি ছিল? তাঁদের জীবন কেমন ছিল? তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পয়গাম সংরক্ষণ করতে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা পৌঁছে দিতে কত কুরবানী পেশ করেছেন? আজ আমরা সেসব বুযুর্গের প্রতিষ্ঠা করা আমলী অবস্থান থেকে কত দূরে সরে এসেছি! আমাদের মাঝে কত দ্রুত ইলম ও আমলের অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়ছে! আমরা এ অধঃপতন থেকে কিভাবে নিস্কৃতি লাভ করতে পারি, একথাও আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে। এই সম্মেলনের পর নতুন উৎসাহ ও নতুন উদ্যম নিয়ে বুযুর্গদের পদচিহ্নকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার ও চিন্তা ও আমলের যেই পথ তাঁরা আমাদেরকে দেখিয়েছেন

সে পথে অবিচল থাকার অঙ্গিকার করা উচিত। আমাদের জীবনকে তাঁদের রেখে যাওয়া আদর্শমত সাজানোর চেষ্টা করা দরকার।

দারুল উলূম কি ও কেন

দারুল উলূম দেওবন্দ কোন গোঁড়া দলের নাম নয়। এটি কোন রাজনৈতিক দলও নয়। এটি এমন কোন দল বা বাহিনীও নয়, যা হক ও নাহক (বাতিল) সর্বক্ষেত্রে একে অপরকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি বাহাছ ও মোনাযেরা (বিতর্ক অনুষ্ঠান)এর এমন কোন টিমও নয়, যা শুধুমাত্র বিশেষ কোন ফেরকার প্রতিরক্ষার জন্য অস্তিত্ব লাভ করেছে, বরং প্রকৃতপক্ষে দারুল উলূম দেওবন্দ কুরআন ও সুন্নাহ্র সেই তাবীরের (ব্যাখ্যার) নাম, যা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও আসলাফে উম্মাতের (উম্মাতের পূর্বসূরী) মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। এটি সেই বিশুদ্ধ ইলমের নাম, যা বুযুর্গানে দ্বীন পেটে পাথর বেঁধে আমাদের পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। এটি চরিত ও কীর্তির সেই সৌরভের নাম, যা সাহাবা ও তাবেঈনের জীবন চরিত থেকে উৎসারিত হয়েছে। এটি সেই অঙ্গিকার ও সংগ্রামের নাম, যার পরম্পরা বদর ও উহুদের ময়দান পর্যন্ত পৌছে। এটি সেই এখলাস, লিল্লাহিয়াত, বিনয়, সরলতা, তাকওয়া, তাহারাত, সত্য কথন ও নির্ভীকতার নাম, যা ইসলামী ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে উলামায়ে হকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। বিগত শতাব্দীতে দারুল উলূম দেওবন্দের সংস্কারমূলক কীর্তি এই যে, সে মুসলমানদের অধঃপতনের যুগে ইলম ও আমলের গুণাবলীকে জীবন দান করেছে এবং এমন মানব কাফেলা তৈরী করেছে, যারা সেসব গুণাবলীর জীবন্ত ও জাগ্রত প্রতীক। বিধায় যে সকল ব্যক্তি এসব গুণাবলীতে গুণান্বিত এবং যাদের এই পথরেখায় প্রথমে নিজের অতঃপর পুরা উম্মতের ইসলাহের ফিকির রয়েছে, সে–ই দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত। সে বাহ্যত যদিও দারুল উলূম দেওবন্দকে কখনো চোখে দেখেনি। আর যারা এসব গুণাবলী অর্জনে উদাসীন এবং এই মিশনের ব্যাপারে বেপরোয়া, দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, যদিও বাহ্যত তাদের নিকট দারুল উলূমের সনদ এবং দস্তার থাকুক না কেন।

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই মাপকাঠিতে আজ আমাদের নিজেদেরকে নিরীক্ষা করে দেখা দরকার যে, আমাদের দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে শতকরা কতভাগ সম্পর্ক ঠিক আছে। এই প্রশ্নের বাস্তবসম্মত উত্তর যদি আমাদের অন্তরে কোনরূপ অনুশোচনা সৃষ্টি করতে পারে, তখন আসল প্রশ্ন এই দাঁড়ায় যে, দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক সৃষ্টি করার ব্যবস্থা কি? আল্লাহ পাক এই সম্মেলন দ্বারা আমাদেরকে এই ফায়দা অর্জন করার তাওফীক দান করেন যে, এই চিন্তা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের চির বেদনার রূপ লাভ করে। এমন বেদনা, যা মৃত অন্তরে নতুন জীবন সঞ্চার করার এবং পতনোন্মুখ পরিবেশে পুনর্জাগরণের প্রাণ সঞ্চারের যোগ্যতা রাখে। আমীন। ছুম্মা আমীন।

সদসালা এজলাসের পর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও যাওয়ার সুযোগ ঘটে। তার মধ্যে থানাভন, গাঙ্গুহ, নানুতা, জালালাবাদ, দিল্লী, আগ্রা, লাক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ অন্তর্ভুক্ত। এসব সফরেরও কিছু বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্য।

ভারতে আরও যেসব ইলমী ও দ্বীনি মারকায রয়েছে সামর্থ্য মোতাবেক সেগুলোর যিয়ারত করা এবং সেখানকার আলেম ও বুযুর্গদের সঙ্গে সাক্ষাত করে উপকৃত হওয়াও অধমের এই সফরের ব্যক্তিগত একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিন সপ্তাহকাল সময়ে এ উদ্দেশ্য যতটুকু পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল আলহামদুলিল্লাহ তা হয়েছে। এগারো দিন দেওবন্দে অবস্থান করি। এই এগারো দিন এগারো মুহূর্তের মত পার হয়ে যায়। দেওবন্দের হযরতদের সঙ্গে মোলাকাতের জন্যই স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সফরের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সম্মেলনের কারণে সেখানে শুধুমাত্র উপমহাদেশেরই নয়, বরং সমগ্র আলমে ইসলামের আলেম, চিন্তাবিদ, বুযুর্গ ও পরহেজগার লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলের সঙ্গেই মোলাকাত করার আগ্রহ ছিল। সুতরাং এই দিনগুলো মধুময় এই কাজেই অতিবাহিত হয়। আর বাস্তবে এই দিনগুলোর মূল্যবান মুহূর্তসমূহ মেপে মেপে ব্যয় করা সত্ত্বেও অনেক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাত করাই সম্ভব হয়নি। আর অনেকের সাথে খুব অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাত হয় এবং অন্তরে তৃপ্তি সহকারে সাক্ষাত করার আফসোস রয়ে যায়।

জামে মসজিদের বয়ান

অধমের ভাতিজা (তিনি বয়সে আমার চেয়ে বড়) মাওলানা শাহেদ হাসান সাহেব দারুল উলূমের উস্তাদদের অন্যতম। তিনি দেওবন্দবাসীদের সাথে সম্মিলিত সাক্ষাতের এই ব্যবস্থা করেন যে, একদিন দেওবন্দের জামে মসজিদে 'তানযীমে আবনায়ে দারুল উলূম' এর পক্ষ থেকে এশার নামাযের পর একটি জলসার ঘোষণা করেন এবং তাতে অধমের বক্তৃতার প্রোগ্রাম রাখেন। তিন দিনব্যাপী সদসালা এজলাসের পর দেওবন্দের সকলে যদিও ক্লান্ত শ্রান্ত ছিল, কিন্তু অধমের ওয়ালিদ মাজিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেবের সঙ্গে তাদের ভক্তি ও ভালবাসার অসাধারণ সম্পর্ক তাদেরকে সে দিনও মাহফিলে টেনে আনে এবং একটি বড় সমাবেশ হয়ে যায়। পাকিস্তানের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মাওলানা সাঈদুর রহমান উলুবী (সম্পাদক, খুদ্দামুদ্দীন) এবং বাংলাদেশের হযরত মাওলানা মুফতী মুহিউদ্দীন সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ) সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। এই জামে মসজিদে মুখ খুলতে অধমের বড় সংকোচবোধ হচ্ছিল। যেই জায়গায় হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) হযরত মাদানী (রহঃ) ও অন্যান্য আকাবিরে দেওবন্দ ভাষণ দান করেছেন, সেখানে এ অধমের মুখ খোলা একটি পরীক্ষার চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু সেসব বুযুর্গের ফয়েযের বরকতেই কিছু কথা নিবেদন করার তাওফীক হয়। সূরায়ে কুরায়েশের উদ্ধৃতি দিয়ে অধম নিবেদন করি যে, মক্কার কুরায়েশ বংশের লোকদেরকে কাবাগৃহের প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে আল্লাহ পাক এই মর্যাদা দান করেছিলেন যে, সমগ্র আরব উপদ্বীপ তাদেরকে শ্রদ্ধা করত। খুন ছিনতাইয়ের সেই অধপতিত পরিবেশেও মক্কার কুরায়েশদেরকে চোর ডাকাতেরাও কিছু বলত না। সমগ্র আরবের লোকেরা সফর করতে ভয় পেত, কিন্তু মক্কার কুরায়েশরা নিশ্চিন্তে সিরিয়া ও ইয়ামানে সফর করত। সেই বাণিজ্যিক সফরের মাধ্যমেই তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হত। আল্লাহ তাআলা সূরায়ে কুরায়েশে মক্কার লোকদেরকে তাঁর এই নেয়ামতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরশাদ করেন যে, তোমাদের এই নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নতা এবং তোমাদের এই সচ্ছল জীবন যাপন বায়তুল্লাহর অনুকম্পা মাত্র। তাই তোমাদের জন্য

বাইতুল্লাহর সম্মান করা এবং তার প্রভুর এবাদত করা অন্যদের তুলনায় অধিক কর্তব্য। এই সূরা থেকে আমরা শিক্ষাই পাই যে, মানব জাতির যে দল পৃথিবীতে কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশেষ সম্মান ও গুরুত্ব লাভ করে, তাদের উপর ধর্ম মেনে চলা অন্যদের তুলনায় অধিক ফরয হয়ে যায়।

কুরআনের এই শিক্ষা সূত্রে অধম নিবেদন করি যে, আল্লাহর শোকর, দেওবন্দ জনপদ বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত ও সুখ্যাত। সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তার নাম উচ্চারণ করা হয়। মানুষ তার অধিবাসীদেরকে ভালবাসে ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। সদসালা এজলাস উপলক্ষ্যে পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে মানুষ যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে এই জনপদে আগমন করেছে, তা থেকে মুসলমানদের অন্তরে এই ভূখণ্ডের যে মর্যাদা ও মূল্য রয়েছে তা প্রতীয়মান হয়। প্রশ্ন হল, আজ সারা বিশ্বে এই বসতির সুনাম কেন ছড়িয়ে পড়ল? এই অন্ধকার ও সংকীর্ণ গলি, কাঁচা পাকা গৃহ, ভাঙ্গা সড়ক ও অবিন্যস্ত বাজারের মধ্যে এমনকি আকর্ষণ রয়েছে, যা লাখ লাখ মানুষকে এখানে টেনে এনেছে। বলাবাহুল্য যে, দেওবন্দের এই সুনাম ও সম্মান একমাত্র এই মহান বিদ্যাপীঠের অনুদান, যা পশ্চাদপদ এই বসতিতে ইলমে দ্বীনের প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকে এক আলোর মিনারে পরিণত করেছে। এভাবে প্রতিটি অন্তরের প্রিয়তম হতে পারা শুধুমাত্র সেসব বুযুর্গের অবদান, যাঁরা এই বসতিতে বসে ইসলামের প্রথম যুগের কথা ও স্মৃতি তাজা করেছেন এবং এই চতুর্দশ শতাব্দীতে দ্বীনের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিধায় আমাদের যাদের দেওবন্দের সঙ্গে যে কোন পর্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের কখনই একথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির চাবিকাঠি শুধুমাত্র সেসব বুযুর্গের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলার মধ্যেই রয়েছে। আর যদি আমরা সেসব বুযুর্গের পথ পরিত্যাগ করে নিজেদের জন্য অন্য কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করি, তাহলে তা আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

এই বিষয়ের উপরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি আমার বক্তব্য পেশ করি। ইমামুল আছর হযরত মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ

সাহেব কাশ্মীরী (কুঃ সিঃ)এর সাহেবজাদা জনাব মাওলানা আনজার শাহ সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ) দারুল উলূমের উচ্চস্তরের উস্তাদদের অন্যতম। বর্তমানে দারুল উলূমের বুখারী শরীফের পাঠদান তাঁর দায়িত্বে রয়েছে। এভাবেই তিনি তাঁর ওয়ালিদ মাজিদের অবস্থানকে সামলে রেখেছেন। তিনি চূড়ান্ত ভালবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করে এই সমাবেশে আগমন করেন। অধম সবেমাত্র বক্তব্য শুরু করেছি এমন সময় তাঁকে আগমন করতে দেখি এবং আমার বক্তব্য চলাকালীন সময়েই তিনি সমাবেশে উপস্থিত হন। সব শেষে তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি বড় হৃদয়ছোঁয়া বক্তব্য রাখেন।

সাইয়েদ আসগর হুসাইন সাহেবের কুটিরে

দেওবন্দে আসার পর হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন সাহেবের (কুঃ সিঃ) বাড়ীতে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলাম। যিনি হযরত মিঞা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। আমার বুঝ হওয়ার পূর্বে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহঃ)এর হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী (রহঃ)এর পর তাঁর উস্তাদ ও মুরুব্বীদের মধ্যে তাঁর সঙ্গেই সর্বাধিক সম্পর্ক ছিল। হযরতের জীবদ্দশায় ওয়ালিদ সাহেব তাঁর নিকট গমন করেননি এমন দিন খুব কমই রয়েছে। আমরা হযরত ওয়ালিদ সাহেবের নিকট থেকে হযরত মিঞা সাহেবের এত অধিক ঘটনা শ্রবণ করেছি যে, মনে হয় যেন আমরা তাঁকে স্বচক্ষেই দেখেছি। হযরতের সাহেবজাদা হযরত হাজী বেলাল সাহেব (মুঃ যিঃ) বর্তমানে হযরতের বাইরের ঘরে থাকেন। আমি তাঁর খিদমতে হাজির হই। বাড়িটি হযরতের জীবদ্দশায় যেরূপ ছিল, তিনি ঠিক সেইরূপেই রেখে দিয়েছেন। হযরত হাজী বেলাল সাহেব (মুঃ যিঃ) অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত স্নেহ ও মুহাব্বতের আচরণ করেন। তাঁর চৌকির নিকট বসে মনে হচ্ছিল যেন, হযরত মিঞা সাহেবের খিদমতে হাজির হয়েছি এবং হযরত ওয়ালিদ সাহেব থেকে শোনা ঘটনাগুলো (যার কিছু অংশ মরহুম ভাইজানের কলমে অনেকবার আল-বালাগে প্রকাশ পেয়েছে।) একটি একটি করে চোখের সামনে ভাসছে।

হযরত মিঞা সাহেব (কুঃ সিঃ) তাঁর জীবদ্দশাতে তাঁর বাড়ীর নিকটবর্তী মসজিদে ছোট একটি মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। মাশাআল্লাহ মাদ্রাসাটি বর্তমানে অনেক উন্নত হয়েছে। মাদ্রাসার নাম 'মাদ্রাসায়ে আসগরিয়া'। হযরত হাজী বেলাল সাহেবের সাহেবজাদা অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম এবং সাইয়্যেদ খলীল মিঞা সাহেব (মুঃ) মাদ্রাসার মুন্তাযিম। সেখানে কুরআনে কারীম এবং প্রাথমিক উর্দু দ্বীনিয়াত শিক্ষা দেওয়া হয়। কখনো কখনো দরসে নিযামীর প্রাথমিক কিতাবসমূহও পড়ানো হয়। মাওলানা খলীল মিঞা সাহেব পীড়াপীড়ি করে একদিন এশার পর খানা খাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন। খানা খাওয়ার মজলিসটিও বড় উপভোগ্য ছিল। অধম দুদিন পর থানাভন, নানুতা ও গাঙ্গুহ যাওয়ার প্রত্যাশী ছিলাম। নিজের জীপ গাড়ী দিয়ে মাওলানা এই সফরটি অতি সহজ করে দেন। তাই দুদিন পর তার গাড়ীতেই আমার সফর হয়।

অধমের জন্য এই এক মাসের সফরের লাভ ছিল মূলত ঐ দিন, যে দিন দেওবন্দ থেকে থানাভন রওয়ানা করি। মন তো চাচ্ছিল নানুতা থানাভন ও গাঙ্গুহের প্রত্যেকটিতে যদি কয়েকদিন করে কাটাতে পারতাম! কিন্তু সময় অল্প বলে একদিনেই তিন জায়গায় যেতে হয়। যার প্রথম মঞ্জিল ছিল নানুতা।

স্বর্ণমানব প্রসবা নানুতা

নানুতা দেওবন্দ থেকে ষোল মাইল পশ্চিমে এবং সাহারানপুর থেকে আঠারো মাইল দক্ষিণে ছোট একটি শহর। শহরটি তার উৎপাদিত ফসল, সুদূর বিস্তৃত বাগান এবং ক্ষেতের কারণে স্বর্ণ প্রসবা। তবে এই ভূমি থেকে ইলম ও আমল ও তাকওয়া–তাহারাতের যত সূর্যের উদ্ভব হয়েছে, সেদিক থেকে এটি স্বর্ণমানব প্রসবাও বটে।

উস্তাযুল কুল হযরত মাওলানা মামলুক আলী সাহেব যিনি ইলমের দিক দিয়ে সমস্ত দেওবন্দী আলেমের পূর্ব পুরুষ। তিনি এই শহরেই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সাহেবজাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুভী (রহঃ) এবং তাঁর বিশিষ্ট সাগরিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ

কাসেম সাহেব নানুতুভী এর জন্মভূমিও এটিই। তাছাড়া মুজাহিরুল উলূম সাহারানপুরের শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মাজহার সাহেব নানুতুভী (রহঃ) ও তাঁর সাহেবজাদাগণ অর্থাৎ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান নানুতুভী (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীর নানুতুভী (রহঃ) এঁরা সকলেই এই শহরের অধিবাসী ছিলেন।

নানুতা পৌঁছে আমরা সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুভী (কুঃ সিঃ)এর মাযারে যাই। মাযারটি গ্রাম থেকে কিছুদূর উত্তরে সাহারানপুরগামী সড়কে অবস্থিত। সবুজ শ্যামল ও সজীব একটি বাগানের ধারে ছোট বেষ্টনীর মধ্যে কয়েকটি কাঁচা কবর রয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিম দিকের সর্বপ্রথম কবরটিই হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর কবর। পবিত্র মাযারে যখন উপস্থিত হই, তখন হযরত (রহঃ)এর অনেক ঘটনাই স্মৃতিপটে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম সদরে মুদাররিস (প্রধান শিক্ষক) এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (কুঃ সিঃ)এর খাস উস্তাদ ছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় উচ্চ পর্যায়ের গুণ ও উৎকর্ষতার অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে অতি সরল, বিনয়ী ও কাশ্‌ফ–কারামতের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন। হযরত থানভী (রহঃ)এর ওয়াজ ও বাণীসমূহ তাঁর আলোচনায় পরিপূর্ণ। হযরত মাওলানা আনোয়ারুল হাসান শেরকুঠি (রহঃ) 'সীরাতে ইয়াকুব ও মামলুক' নামে তাঁর জীবন চরিত সংকলন করেন। গ্রন্থটি 'মাকতাবায়ে দারুল উলূম' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এ সময় হযরত ওয়ালিদ সাহেবের নিকট থেকে বার বার শোনা সেই ঘটনাটি আমার স্মরণ হয়, যা সীরাতে ইয়াকুব ও মামলুক গ্রন্থে আমি পাইনি। ঘটনাটি এই ঃ হযরত মাওলানা দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ হওয়া ছাড়াও তরীকতের শায়েখ এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কেন্দ্রও ছিলেন। ফলে তাঁর নিকট সর্ব শ্রেণীর মানুষ খুব বেশি যাতায়াত করত। যে কারণে কোন কোন সময় তাঁর মাদরাসার দরসগাহে পৌঁছতে দেরী হত। হযরত মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব (রহঃ) সে সময় দারুল উলূমের মুহতামিম ছিলেন। তিনি এ অবস্থা দেখে দারুল উলূমের

পৃষ্ঠপোষক কুতবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ)এর নিকট অভিযোগ করেন। হযরত গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ) প্রথমে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবকে বুঝিয়ে বলেন ঃ

'মাওলানা! এরূপ মনে করবেন না যে, আপনি মানব সেবায় ব্যস্ত থাকায় অপারগ। আপনি যাদের সেবা করছেন, তারা তো স্থানীয় লোক। কিন্তু এসব ছাত্র যারা অনেক দূর–দূরান্ত থেকে ইলম হাসিল করার জন্য এসেছে তাদের সময় নষ্ট হলে আখেরাতে আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' একথা শুনে হযরত মাওলানা মাথা নত করলেন। কিন্তু পরে তিনি হযরত মুহতামিম সাহেবকে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ

'আমি মওলবী মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবকে সময়ের অনুবর্তী হওয়ার জন্য বলে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কখনো তাঁর থেকে এ জাতীয় সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আপনি এ বিষয়ে খুব বেশি ফিকির করবেন না। কারণ আল্লাহর কসম! মওলবী মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব এত উঁচু মাকামের লোক যে, সে যদি একটি সবকও না পড়ায় এবং প্রতিদিন মাদ্রাসাতে একবার মাত্র এসে ঘুরে যায় তাহলেও মাদ্রাসার জন্য যথেষ্ট এবং তাঁর বেতনের কাজ উসূল হয়ে যাবে।'

তাঁর ওফাতের এই ঘটনাটিও হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহঃ)এর নিকট থেকেই শুনেছিলাম। এটিও তাঁর জীবন চরিতে উল্লেখ নেই। ঘটনাটি এই ঃ

দেওবন্দের দিকে দিকে মহামারী আকারে কলেরা শুরু হয়। তখন হযরত মাওলানার সম্ভবত এ বিষয়ে কাশফ হয়েছিল। তাই তিনি দেওবন্দে ঘোষণা করিয়ে দেন ঃ 'ঘরে ঘরে কলেরার মারাত্মক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে। লোকজন যেন খুব বেশি করে দান–খয়রাত করে এবং নিজের মালিকানাধীন সব বস্তু থেকেই যেন ছদকা করে। টাকা থেকে টাকা, শস্য থেকে শস্য এবং কাপড় থেকে কাপড় যেন দান করে। হয়ত আল্লাহ তাআলা এই দানের বরকতে এই বিপদ বন্ধ করে দিবেন।'

কিন্তু দেওবন্দের কোন কোন শেখ পুত্র এ কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ তো করলই না বরং উল্টা ঠাট্টা করে বলতে লাগল ঃ 'মনে হচ্ছে যেন

মাদ্রাসার চাঁদার অভাব দেখা দিয়েছে, তা পুরা করার জন্য মওলভী সাহেব এরূপ ঘোষণা করছেন।'

হযরত একথা শুনতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ 'ঠিক আছে! এখন মহামারী আসবেই এবং একেকটি ঘর থেকে কয়েকটি করে জানাযা বের হবে।'

উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বলল ঃ 'হযরত! আপনিও তো এখানেই অবস্থান করছেন।'

তিনি বললেন 'হ্যাঁ, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানেরাও এই মহামারীতেই চলে যাবে।'

যাই হোক, সেই মারাত্মক মহামারী দেখা দেয় এবং তাতেই হযরতের ওফাত হয়।

এই ঘটনাটিও প্রসিদ্ধ আছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানার কবরের মাটিকে এই মহামারীতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য নিরাময়ের বস্তু বানিয়ে দেন। কোন বাড়ীতে কোন লোকের কলেরা হলে মাওলানার কবর থেকে কিছু মাটি নিয়ে যেত এবং তা ব্যবহার করার বরকতে আল্লাহ তাআলা রোগীকে সুস্থতা দান করতেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব (রহঃ)এর পাশে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীর সাহেব নানুতুভী (রহঃ)এর পবিত্র মাযার। তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহার সাহেব নানুতভী (রহঃ)এর সাহেবজাদা এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতভী (রহঃ)এর শ্যালক ছিলেন। শামেলীর যুদ্ধে তিনি হযরতের ডান হাত ছিলেন। ১৩১১ হিজরী থেকে ১৩১৩ হিজরী পর্যন্ত তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিমও ছিলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (কুঃ সিঃ) 'আরওয়াহে ছালাছা' কিতাবে তাঁরই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, একবার তিনি মাদ্রাসার ফাণ্ডের আড়াইশ' টাকা নিয়ে মাদ্রাসার রিপোর্ট ছাপানোর জন্য দিল্লী যান। ঘটনাচক্রে সেখানে টাকাগুলো চুরি হয়ে যায়। তিনি চুরির ঘটনা কাউকে না জানিয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরে এসে জমি বিক্রি করেন। জমি বিক্রি করা টাকা থেকে আড়াইশ' টাকা নিয়ে পুনরায় দিল্লীতে যান এবং রোয়েদাদ (রিপোর্ট) ছাপিয়ে নিয়ে আসেন।

কিছুদিন পর ঘটনাটি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানতে পারে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীর সাহেব তাদের কথায় যে এই টাকা ফেরত নিবেন না, এ ধারণা তাদের ছিল। তাই দারুল উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষক কুতবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ)এর নিকট ঘটনাটি বিস্তারিত লিখে তাঁর থেকে এই বিষয়ে সমাধান চাওয়া হয়। তিনি উত্তর দেন যে, 'মওলভী সাহেবের নিকট টাকাগুলো আমানতস্বরূপ ছিল। তাঁর সীমালংঘন ছাড়া সেগুলো খোয়া গেছে বিধায় তিনি এর জন্য দায়ী নন।'

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হযরত মাওলানা মুনীর সাহেবকে হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)এর ফতওয়া দেখিয়ে উক্ত টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত মাওলানা মুনীর সাহেব (রহঃ) তাদেরকে উত্তর দেন যে, 'মিঞা রশীদ কি আমার জন্যই ফিকাহ পড়েছে? এসব মাসআলা কি আমার জন্যই? তিনি নিজের বুকে হাত রেখে একটু দেখুক তো, যদি তাঁর এমন ঘটনা ঘটত তাহলে কি তিনি সে টাকা নিতেন? চলে যাও। এই ফতওয়া নিয়ে যাও। আমি কখনই দুই পয়সাও নিব না।'

মা'রেফাতের কেন্দ্র থানাভনে

নানুতা থেকে আমরা রওয়ানা করলাম। থানাভন আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল। সেই থানাভন, যার স্বাদ ও আনন্দময় কল্পনাতেও দেহ–মনে ভক্তি ও ভালবাসার অফুরন্ত ঝর্ণা উৎসারিত হতে থাকে। সেই থানাভন, যার আলোচনায় মুখরিত পরিবেশে এই অধম চোখ মেলে এবং যার নির্মল আলোচনা ছিল হযরত ওয়ালিদ সাহেবের সকাল–সন্ধ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই থানাভন, যেখান থেকে উৎসারিত অফুরন্ত আলোকমালা এখনও জীবনের বন্ধুর পথে নাজানি আমার মত কত পথহারা লোকের পথের দিশার একমাত্র অবলম্বন। আজ আমি বাস্তব জগতে কল্যাণের সেই উৎস, মারেফাতের সেই দোকান অভিমুখেই পথ ধরেছিলাম। আজ আমার আত্মার জগত আবেগ ও আনন্দের এক অভিনব ঝর্ণাধারায় টইটুম্বুর।

ইতিপূর্বে আমি থানাভন ও তার খানকার অনেক রকম অবয়বই

কল্পনা করেছি। কিন্তু মাটির কাঁচাপথ অতিক্রম করে আমাদের এই ক্ষুদ্র কাফেলা যখন খানকার দুয়ারে উপনীত হলো, তখন পূর্ব কল্পিত সকল অবয়বের তুলনায় তা অনেক সরল, ছোট ও মনোহরী দেখতে পাই। যতটুকু স্মরণ হয়, খানকায়ে আশরাফীতে আমি এই প্রথমবার হাজির হই। কিন্তু এর এক একটি বস্তু দেখে মনে হচ্ছিল যে, এখানকার সম্পর্কে কত বছর ধরে আমি অবগত এবং কতদিন ধরে তা দেখে আসছি।

হযরত মাওলানা শিব্বির আলী থানভী (রহঃ) পাকিস্তান গমনের পর হযরত মাওলানা জহুরুল হাসান সাহেব (রহঃ) এই খানকার ব্যবস্থাপনার কাজ হাতে নেন। তিনি খানকার প্রত্যেকটি বস্তু সেই ধাঁচে ঠিক রাখার পূর্ণ চেষ্টা চালান, যেভাবে তা হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এর যুগে ছিল। বর্তমানে তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা নূরুল হাসান সাহেব খানকার প্রধান পরিচালক। মাওলানা মাসিহুল্লাহ খান সাহেবের সঙ্গে তাঁর এসলাহী সম্পর্ক। যুবক হওয়া সত্ত্বেও তিনি খানকার নিয়ম শৃঙ্খলা পূর্বের ন্যায় টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

খানকায় প্রবেশ করলাম। তার প্রতিটি কোণ থেকে যেন এই ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল—

میرے دلِ وارفتہ حیرت کو ہے اب تک
اس نازشِ صد ناز کی ایک ایک ادا یاد

'আমার অন্তরাত্মা এখনও বিস্ময়ে অভিভূত, প্রেমাস্পদের এক একটি অঙ্গ ভঙ্গী স্মরণ করে।'

খানকাটি প্রথমে শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ), হযরত মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানভী (রহঃ) ও হাফেয যামেন শহীদ (রহঃ)এর রূহানী ফয়েয বিতরণ কেন্দ্র ছিল। এই বুযুর্গত্রয় যাঁদেরকে 'আক্তাবে ছালাছা' বলা হত। দীর্ঘদিন এই খানকাতে ইসলাহ ও ইরশাদ এর কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের এই মিশনকে সামনে রেখেই খানকাটিকে 'মারেফাতের দোকান' বলা হত। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বৃটিশ বিরোধী জিহাদে যখন হযরত মাওলানা

যামেন সাহেব শহীদ হন এবং হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) হিজরত করে মক্কা মুকাররমায় চলে যান, খানকা তখন শূন্য হয়ে পড়ে। ফলে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) মক্কা থাকা অবস্থায় খানকাটি পুনরায় আবাদ করার বিষয় নিয়ে ভাবতেন। যখন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তাঁর পবিত্র হাতে বাইয়াত হন, তখনই তাঁর দূরদৃষ্টি মারেফাতের এই মারকায পুনরায় আবাদ করার নিমিত্তে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)কে মনোনীত করে। তিনি তাঁকে তাকীদ করে বলেন যে, আপনি যখনই কানপুর থেকে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দেবেন, তখন অন্য কোন মাদ্রাসায় না গিয়ে থানাভনের খানকা আবাদ করবেন। বিধায় হযরত থানভী (রহঃ) কানপুর থেকে চলে আসার পর নতুন করে খানকা আবাদ করেন। পরবর্তীতে এখান থেকে ইলম ও মারেফাতের যেই খুশবু ও নূর উৎসারিত হয়, তা বিরাট এক জগতকে মোহিত করে।

মাওলানা নূরুল হাসান সাহেব খানকার বিভিন্ন অংশ ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন। আর আমার কল্পনার চক্ষু ৩৮ বছরের ব্যবধান অতিক্রম করে এখানে সেই পুতপবিত্র আসর সাজানো রূপে দেখতে পাচ্ছিল, যার মধ্যমনি ছিলেন হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী সাহেব থানভী (রহঃ)। যেখানে হযরত খাজা আযিযুল হাসান মাজযূব (রহঃ), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান সাহেব (রহঃ), হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহঃ), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব দেওবন্দী (রহঃ), হযরত মাওলানা শাহ ওসীউল্লাহ সাহেব (রহঃ), হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ সাহেব জালেনধরী (রহঃ), হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী সাহেব ফুলপুরী (রহঃ), হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান সাহেব নদভী (রহঃ), হযরত মাওলানা আবদুল বারী সাহেব নদভী (রহঃ)এর ন্যায় আরও নাজানি কালের কত দুর্লভ ব্যক্তিত্বের এ আসর-প্রদীপের চতুর্পার্শ্বে পতঙ্গসম সমাগম ঘটেছে। এখান থেকে বের হয়ে তাঁদের এক একজনের যে অবস্থা হয়েছে, তা আমার মুর্শিদ হযরত আরেফীর (রহঃ) ভাষায়—

مری آنکھوں میں چشمِ مستِ ساقی کا وہ عالم ہے
نظر بھر کر جسے بھی دیکھ لوں مے خوار ہو جائے

'সাকীর প্রেমে মত্ত আমার চক্ষুদ্বয়ের এমন অবস্থা যে, নজর ভরে একবার যাকে দেখে নেব সেই সুরাপায়ী হয়ে যাবে।'

মসজিদের আঙ্গিনায় বসে স্মরণ হল, সাইয়েদী ও মুর্শিদী হযরত ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল হাই সাহেব আরেফী তদীয় প্রণীত 'মাআছিরে হাকীমুল উম্মত' গ্রন্থের সূচনাতে এই খানকার পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন ও তার চুলচেরা বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের সেই অংশ এখানে বসে অধ্যয়ন করা দরকার। তাই আমরা সকল সঙ্গী সেখানে উপবেশন করে সম্মিলিতভাবে তা অধ্যয়ন করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের হযরতের মর্যাদায় অবিরত উন্নতি দান করুন এবং তাঁকে তাঁর অবারিত ফয়েয সহকারে দীর্ঘদিন নিরাপদে রাখুন। তিনি যে আবেগ ও প্রেম নিয়ে খানকার চুলচেরা চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার সঠিক মূল্য ও মর্যাদা একমাত্র সেখানে গিয়েই বুঝে আসে। আজও যেহেতু খানকার অধিকাংশ বস্তু সেই চিত্র অনুপাতে বিদ্যমান রয়েছে, তাই এখানে বসে তা অধ্যয়ন করলে মনে হয় যেন হযরত নিজে আমাদেরকে সম্বোধন করে এখানকার সকল বিষয় বিশ্লেষণ করে বুঝাচ্ছেন। খানকার ক্ষুদ্র কোন বস্তুও এমন নেই, যা এই চিত্রে তুলে ধরা হয়নি। এমন বিস্তারিত ও সূক্ষ্মরূপে চিত্রাঙ্কন একমাত্র প্রেমপূর্ণ হৃদয়ই করতে সক্ষম। এটা বিবেক বুদ্ধির আয়ত্বের বিষয় নয়।

বাহ্যত এটি ছোট একটি মসজিদ। যার ভিতরে তিনটি মাত্র কাতার হয়। আঙ্গিনা ও বারান্দাও খুব বেশি প্রশস্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই ছোট জায়গা থেকে এমন মহিমান্বিত কাজ নিয়েছেন যে, এখান থেকে প্রায় এক সহস্র উচ্চস্তরের গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ওয়াজ ও উপদেশের এক অপূর্ব রং অস্তিত্বলাভ করেছে। হাকীকত ও মারেফাতের সাগর প্রবাহিত হয়েছে। তরীকত ও তাসাওউফের সংস্কার হয়েছে। ইলম ও আমল বিষয়ক সমস্যাবলীর সমাধান করা হয়েছে। ইলমে নবুওয়্যাতের সূক্ষ্ম রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। হাজার মানবকে উন্নত চরিত্র ও উৎকৃষ্ট

সামাজিকতার মনোরম অবকাঠামোতে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ভদ্রতা ও মানবতা নতুন জীবন লাভ করেছে। শরীয়ত, আকল ও ইশকের সীমারেখা তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়ত্রয়ের সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ সংমিশ্রনে এমন জীবনবোধ অস্তিত্ব লাভ করেছে, যা এই আখেরী যুগে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র বাস্তব ব্যাখ্যার নামান্তর। এ সকল বিষয়ের কল্পনা হযরত ওয়ালিদ সাহেবের সেই কবিতা স্মৃতিতে জাগরিত করে, যা তিনি এই খানকার ব্যাপারেই বলেছিলেন--

کبھی یہ جگہ منزلِ ادیب تھی　　فرشتوں کی محفل تھی، بزمِ ہدیٰ تھی
یہ مسکن تھی اک دن حکیم اُمّ کی　　ہَوا اس کی ہر اک مرض کی دوا تھی
یہ چھوٹی سی بستی، یہ چھوٹی سی مسجد
یہ چھوٹی سی مجلس خدا جانے کیا تھی؟

'এক সময় এই স্থানে আল্লাহর ওলীদের অবস্থান ছিল, ফেরেশতাদের সমাবেশ ছিল, হেদায়েতের আসর ছিল। একসময় এটা হাকীমুল উম্মতের আবাসস্থল ছিল। এর বায়ু সকল রোগের ঔষধ ছিল। ছোট্ট এই বসতি, ছোট্ট এই মসজিদ, ছোট্ট এই মজলিস, আল্লাহই জানেন কি ছিল?'

খানকা থেকে বের হয়ে কবরস্থান অভিমুখে রওয়ানা হই। পথিমধ্যে সর্বপ্রথম একটি চার দেওয়ালের মাঝে হযরত হাফেজ মুহাম্মাদ যামেন সাহেব শহীদ (রহঃ)এর মাযার। প্রথমে সেখানে যাই। তিনি অত্যন্ত উঁচু মাকামের বুযুর্গ ছিলেন। যিনি নিজের আধ্যাত্মিক হালাত ও মাকাম রসিকতার আড়ালে গোপন করে রাখতেন। সারাটি জীবন খানকায় বসে ইসলাহের কাজে অতিক্রান্ত করেন, আর যখন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জিহাদে আল্লাহর জন্য দেহ ও আত্মা উৎসর্গ করার সময় উপস্থিত হয়, তখন খানকার মাদুরে উপবেশনকারী এই ব্যক্তিত্বই মুজাহিদদের কাতারে নিজের মস্তকের উপঢৌকন নিয়ে সর্বাগ্রে ছিলেন। এমনকি তিনি এই জিহাদেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে এখানকার মাটিতে সুখনিদ্রায় শায়িত আছেন।

بنا کردند خوش رسمے بخاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

'তাঁরা মাটি ও রক্তে গড়াগড়ি খাওয়ার এক আজব প্রথা প্রতিষ্ঠা করেছেন, আল্লাহ তাআলা এ সকল সৎ স্বভাবসম্পন্ন প্রেমিকদের উপর রহমত অবতীর্ণ করেন।'

এখান থেকে সামান্য অগ্রসর হলেই হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)এর ওয়াকফকৃত কবরস্থান আরম্ভ হয়। কবরস্থানের পশ্চিম প্রান্তে তিন কবর বিশিষ্ট একটি চত্বর রয়েছে। তার প্রথম কবরে যুগের সেই মুজাদ্দিদ বিশ্রাম করছেন, যাঁর ফয়েয ও বরকতসমূহ এই ছোট্ট বসতীকে এই আখেরী যুগে শত শত পুষ্পোদ্যানের ঈর্ষার বস্তু বানিয়েছে। পবিত্র এই মাযারের সম্মুখে বসে এমন অনুভব হচ্ছিল, যেন জগতের সকল কষ্ট–ক্লেশ দূর হয়ে গেছে। আমার পূর্ণ অস্তিত্ব প্রশান্তি ও সাকীনার ক্রোড়ে অবস্থান নিয়েছে। আধ্যাত্মিক হালাত, মাকাম, কাইফিয়াত, ওয়ারেদাত এগুলো তো আধ্যাত্ম জগতের উপরোস্থ লোকদের বিষয়। আমাদের ন্যায় রস ও রুচিহীন অন্ধ আত্মার লোকদের এ সবের পরশ কিরূপে লাগবে? কিন্তু হযরতের পদপ্রান্তে বসে অন্তরে যে প্রশান্তি লাভ হয়েছে তা আমার এই সফরের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ বলে মনে হচ্ছিল—

کرتی جائی ہے سرایت جان و تن میں ان کی یاد
رفتہ رفتہ جانے کیا سے کیا ہوا جاتا ہوں میں

'তাঁর স্মরণ আমার দেহ মনে বিস্তার লাভ করছে, ক্রমে ক্রমে আমার মধ্যে কি এক পরিবর্তন ঘটছে।'

নামাযের সময় সন্নিকটে ছিল বিধায় ফিরে এসে খানকার মসজিদে জোহর নামায আদায় করি। নামাযান্তে হঠাৎ স্মরণ হল ঃ এই সময়েই হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)এর আম মজলিস হত। নিজের অজান্তেই হযরত (রহঃ)এর বৈঠকখানা অভিমুখে পা চলতে আরম্ভ করল। কিছু সময় মজলিসের স্থানে বসে থাকি। তখন অন্তর্জগতে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভাবছিলাম আটত্রিশ বছর

অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যে স্থানে এমন প্রশান্তি, প্রেমদাহ, নূর ও বরকত বিরাজ করছে, তাহলে এ মজলিস যখন জীবন্ত ও উদ্ভাসিত ছিল, তখন এর অবস্থা কেমনটিই না ছিল।

ترے وصال کا عالم نہ جانے کیا ہوگا؟
ترے فراق کی لذت سے مر گئے ہیں لوگ

'যার বিচ্ছেদ–স্বাদে প্রেমিকগণ আত্মদান করে, তার মিলন–স্বাদ যে কেমন হবে?'

আমার অজান্তেই হৃদয় থেকে দুআ বের হয়ে এল—হে আল্লাহ! এই মজলিসের বদৌলতে আপনি হাজার হাজার মানুষের জীবনধারা পরিবর্তন করেছেন। হাজার হাজার অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। এখান থেকে এমন লোক পয়দা করেছেন, যারা তাদের ফয়েয ও বরকত দ্বারা এক জগতকে পরিতৃপ্ত করেছে। যদিও আমরা এমন সময় এখানে এসেছি, যে সময় এ পবিত্র মজলিস বরখাস্ত হয়েছে। জগত যার আলোকে উদ্ভাসিত সেই মহান ব্যক্তিত্ব আত্মগোপন করেছে। কিন্তু হে আল্লাহ! এই মজলিসকে এই প্রভাব প্রতিক্রিয়া দানকারী আপনিই ছিলেন। মজলিসকে বিপ্লবাত্মক আপনিই বানিয়েছিলেন। আপনার সত্ত্বা চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আপনার সেই করুণা যা এই মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উপর অবতীর্ণ হত, তা সদা সজীব ও সতেজ। হে প্রভু! স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে এই মজলিসের ফয়েয ও বরকতের কিছু অংশ আমাদেরকে দান করুন এবং আমাদের ন্যায় দুরাবস্থাগ্রস্থ লোকদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

এই দুআর সাথে সাথেই সাইয়েদী ও মুর্শীদী হযরত ডঃ আবদুল হাই সাহেব আরেফী (মুঃ যিঃ)এর কবিতা গুচ্ছ স্মরণ হল—

وہ نظر آتا ہے دیکھ اے دل سوادِ کوئے دوست
گوشے گوشے سے جہاں کے آرہی ہے بوئے دوست
آج آساں ہو گئی دُشواریٔ منزل مجھے
کھینچ لایا مجھ کو میرا جذبۂ دل سوئے دوست
اے وفورِ شوق اتنی فرصتِ نظارہ دے
جذب کرلے میری ہستی اپنے ہر انداز میں
جذب کرلوں دیدہ و دل میں بہارِ رُوئے دوست
ہاں مجھے بھی رنگ لے اپنے رنگ میں اے خوئے دوست

'হে অন্তর! দেখ বন্ধুর বাসস্থানের পথচ্ছবি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।
সেখানকার প্রতি কোণ থেকে বন্ধুর ঘ্রাণ ভেসে আসছে।
আজ আমার জন্য গন্তব্যস্থলের কষ্ট-ক্লেশ সহজ হয়েছে।
হৃদয়ের আবেগ আমাকে বন্ধুর দিকে টেনে এনেছে।
হে অফুরন্ত আবেগ!
প্রেমাস্পদকে দেখার এতটুকু অবকাশ আমাকে দাও!
যেন বন্ধুর চেহারার রূপরাজি নয়নে ও হৃদয়ে আহরণ করে নিতে পারি।
হে আমার অস্তিত্ব!
আমার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিতে বন্ধুর রূপ আহরণ কর।
হে বন্ধুর প্রকৃতি!
হ্যাঁ, আমাকেও তুমি তোমার রঙ্গে রঞ্জিত কর।'

থানাভন থেকে বিদায় নেওয়ার পর কিছু সময় জালালাবাদে হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব (দাঃ বাঃ)এর খেদমতে হাজির হই। তিনি হাকীমুল উম্মত (রহঃ)এর অন্যতম বিশিষ্ট খলীফা। জালালাবাদে তাঁর পৃষ্ঠপোষকাধীন একটি বিশাল মাদ্রাসা রয়েছে, যা তাঁর বরকতে খানকাও হয়েছে। শুধু হিন্দুস্থানেই নয় বরং আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও তাঁর ফয়েয চালু আছে। মুসলমানদের বিরাট একটি দল তাঁর থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হচ্ছে।

হযরত আমাদের সাথে স্বভাবসুলভ অত্যন্ত স্নেহের আচরণ করেন। তাঁর সোহবতের কয়েকটি মুহূর্তও মহামূল্যবান নেয়ামত। যা দ্বারা আল্লাহ পাক আমাকে ভূষিত করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতের ছায়া দীর্ঘদিন নিরাপত্তা সহকারে জারী রাখুন। আমীন।

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ)এর মাযারে

জালালাবাদ থেকে রওয়ানা হওয়ার পর প্রায় চল্লিশ মিনিটে আমরা গাঙ্গুহ পৌঁছি। এটি সেই মহান বসতী, যা হযরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহঃ)এর যুগ (দশম হিজরী শতক) থেকে আল্লাহওয়ালাদের কেন্দ্র। ত্রয়োদশ শতকের শেষে এবং চতুর্দশ শতকের শুরুতে এখানে ইমামে রব্বানী কুতবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ)এর হেদায়েতের যেই মাসনাদ সজ্জিত হয়, তা কেবলমাত্র এ অঞ্চলকেই শুধু নয়, বরং পুরো উপমহাদেশকে ইলমে নুবওয়াতের নূর দ্বারা উদ্ভাসিত করে।

গাঙ্গুর জনবসতীর বাইরে নিবিড় বৃক্ষরাজির ছায়ায় একটি কাঁচা চত্বরে হযরত গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ)এর মাযার। মাযার তো নয়, সাধাসিধা কাঁচা একটি কবর। কিন্তু মনে হয় যেন এখানে জালাল ও জামালের (তেজস্বী ও স্নিগ্ধ সিফাতের) এক জগত অবস্থান করছে।

হযরত গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ) আমাদের দেওবন্দী তামাম বুযুর্গের মাথার মুকুট এবং কাফেলা প্রধান। তাঁর সারাটি জীবন ছিল ইত্তিবায়ে সুন্নাতের মূর্ত প্রতীক। তিনিই প্রচলিত বেদআতসমূহের বিরুদ্ধে এহ্ইয়ায়ে সুন্নাতের পতাকা উত্তোলন করে দেওবন্দী মাছলাককে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেন। দিল্লীতে হযরত মাওলানা মামলুক আলী সাহেব এবং হযরত শাহ আবদুল গনী সাহেব মুজাদ্দিদী (রহঃ) থেকে ইলম হাসিল করার পর একবার তিনি হযরত মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানভী সাহেবের সাথে মোনাযেরা (বিতর্ক) করার জন্য থানাভন গমন করেন। সেখানে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজেরে মক্কী (কুঃ সিঃ)এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। ফলে মোনাযেরা অমনিই রয়ে যায়। তিনি সেই সাক্ষাতেই হযরত হাজী সাহেবের নিকট বায়আত হন এবং বিয়াল্লিশ দিন সেখানকার খানকায়

অবস্থান করেন। মাত্র এক জোড়া কাপড় পরিহিত ছিলেন। ওটিই ধুয়ে পুনরায় পরিধান করতেন। ৪২ দিন পর সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) তাঁকে খেলাফত দান করেন এবং বলেন ঃ 'মিঞা মওলভী রশীদ! আল্লাহ তাআলা আমাকে যে নেয়ামত দিয়েছিলেন তা আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।'

গাঙ্গুহ পৌঁছে দীর্ঘদিন আত্মনিমজ্জিত অবস্থা বিরাজ করে। কোন এক ব্যক্তি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)এর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করলে হযরত হাজী সাহেব বলেন ঃ 'মিঞা! তিনি যে মানব বসতীতে আছেন তাই গনীমত মনে কর। তাঁর উপর দিয়ে যে অবস্থা গিয়েছে, যদি আল্লাহ তাআলার তাঁর দ্বারা মানুষের ইসলাহের কাজ নেওয়া উদ্দেশ্য না হত, তাহলে তিনি কোন গিরিগুহায় বসে থাকতেন, তা আল্লাহই ভাল জানেন।'

একবার স্বয়ং হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) পত্র লিখে তাঁর হালত জানতে চান। উত্তরে তিনি যেই হালত বর্ণনা করেন, তা থেকে তাঁর উচু মাকাম সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, 'শরীঅত আমার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। প্রশংসা ও নিন্দা সমান মনে হয়। শরীঅতের কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন আর অবশিষ্ট নেই।'

আমি অধম এই বাক্যগুলো হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহঃ)এর নিকট থেকে এবং সাইয়্যেদি ও মুর্শিদী হযরত ডঃ আবদুল হাই সাহেব আরেফী (মুঃ) থেকে বারবার শুনেছি। সাথে একথাও শুনেছি যে, এই চিঠি যখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)এর নিকট পৌঁছে, তখন তিনি এটি মাথার উপর রাখেন এবং বলেন, 'আল্লাহু আকবার! আমার তো এখনো এই হালত হাসিল হয়নি।'

হযরত গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ)এর পবিত্র মাযারের হাজিরা আমার এই সফরের প্রাপ্ত মহামূল্যবান বস্তুসমূহের অন্যতম। ইলম, আমল, তাকওয়া, পরহেজগারী ও শ্রম সাধনার এই মূর্ত প্রতীক যেই ভূমিতে বিশ্রাম করছেন, সেখানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নূর ও বরকতের কত বারি যে বর্ষিত হয়, তার আসল খবর তো একমাত্র আল্লাহ পাকই অবগত আছেন। তবে নিশ্চিতভাবে আমাদেরও এতটুকুও অনুভূত হয়—

خاکِ قبرش از من و تو زندہ تر

'তাঁর কবরের মাটি আমার তোমার থেকে অধিকতর জীবন্ত।'

আসরের আযান হয়েছিল। মাযারের পাশের ছোট মসজিদটিতে নামায আদায় করি। তার পর খানকার দিকে যাই। খানকাটি জনবসতীর মাঝামাঝি 'মহল্লা সারায়ে'তে অবস্থিত। এটি মূলত হযরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী সাহেব (কুঃ সিঃ)এর খানকা। তিনি দশম হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত আল্লাহওয়ালাদের অন্যতম বুযুর্গ। তাঁর পবিত্র মাযার খানকার বেষ্টনীর মধ্যেই অবস্থিত। ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ) তাঁরই বংশধর। হযরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুস সাহেব (কুঃ সিঃ)এর এই খানকা একেবারে বিরান ও উজাড় হয়ে পড়েছিল এবং গোশালায় পরিণত করা হয়েছিল। হযরত গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ) নিজ হাতে তা পরিষ্কার করে নতুন করে আবাদ করেন। তার পর নিজ ব্যয়ে তিন দরজাবিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করেন এবং সেখানে দাওরায়ে হাদীসের দরস শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে কিছু হিংসুটে লোক হযরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুস সাহেব (কুঃ সিঃ)এর গদিনশীনদের কান ভারি করে এবং বলে যে, 'সে খানকা দখল করেছে।' সুতরাং তারা একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে হযরতের কাছে এসে বলে যে, আপনি এ জায়গা ছেড়ে দিন। তারা এমন সময় এ দাবী করে, যখন হযরত নিজ ব্যয়ে সেখানে গৃহ নির্মাণ করিয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা সেখানে এসে অবস্থান নিয়েছে। সিহাহ্ সিত্তাহ্ এর দরস চালু হয়েছে এবং ৩০০ বছর পর পুনরায় খানকা আবাদ হয়েছে। অন্য কোন ব্যক্তি হলে গদিনশীনদের এই দাবীতে ঝগড়া বিবাদ করত বা কমপক্ষে কোর্টে মোকাদ্দমা করার পর্যায়ে চলে যেত। অন্য কেউ হলে খানকার উপর আধিপত্য ঠিক রাখার জন্য দ্বীনের নামেই নাজানি কত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করত। দ্বীনের খেদমত এবং তরীকতের সংরক্ষণের কত না দোহাই দিতো। মোটকথা এভাবে ঝগড়া বিবাদের বৈধতার জন্য অনেক উপাদানই হাতে আসত। কিন্তু তাঁর তো 'শরীঅত স্বভাবে পরিণত হয়েছিল' সরকারে দো আলম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

এই মহান বাণী তাঁর সামনে ছিল ঃ

انا زعيم ببيت فى وسط الجنة لمن ترك المراء و هو محق

'যে ব্যক্তি হকের পক্ষে হয়েও বিবাদ পরিত্যাগ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী জায়গায় ঘর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।'

হযরত সেই গদিনশীনদেরকে পাল্টা এই প্রশ্নও করেননি যে, 'যখন হযরত শায়েখের এই হুজরা আস্তাবলে পরিণত হয়েছিল সে সময় আপনারা কোথায় ছিলেন?'

বরং মুহূর্ত সময় দেরী না করে তিনি বললেন, 'এ কাজের জন্য এত লোকের কষ্ট করার প্রয়োজন ছিল না। আপনারা যে কোন একজন লোক মারফত বলে পাঠালেই আমি জায়গা খালি করে দিতাম।'

সুতরাং তিনি অনতিবিলম্বে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দিক ও অঞ্চল থেকে আগত নিবেদিতপ্রাণ সাগরিদদের বিরাট এক দল এই ঘটনায় অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে বলে দিলেন, 'যে ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে একটি শব্দও মুখ থেকে বের করবে, সে আমার বন্ধু নয়, শত্রু।' সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজের সামানাপত্র সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে নিকটবর্তী মসজিদে রাখলেন এবং আল্লাহর ঘরে অবস্থান করলেন।

এমন তুলনাহীন আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা, এখলাস, সংযম ও সহনশীলতার ফল আল্লাহ পাক এই দান করেন যে, মাত্র কয়েকদিন যেতেই গদিনশীন লোকেরা নিজেদের কাজের উপর লজ্জিত হয়ে পুনর্বার এসে দরখাস্ত করে যে, আপনি ওখানেই চলে যান এবং খানকা পুনরায় আবাদ করুন। হযরত প্রথম দিকে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু তাদের পীড়াপীড়ি দেখে পুনর্বার সেখানে চলে যান এবং আজীবন সেই খানকাতে অবস্থান করেন।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানতুভী (রহঃ), হযরত শাইখুল হিন্দ (কুঃ সিঃ) ও হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেব রায়পুরী (রহঃ) থেকে শুরু করে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী সাহেব (রহঃ),

হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহেব সাহারানপুরী, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া সাহেব কান্ধলাভী (রহঃ), হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশেক ইলাহী সাহেব মীরাঠী (রহঃ) পর্যন্ত দ্বীনের কত উজ্জ্বল নক্ষত্র এই খানকা থেকে ফয়েয হাসিল করেছেন এবং তাবলীগের এই নীরব কেন্দ্র দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে শুরু করে জিহাদ ও কিতাল পর্যন্ত কত না বিশাল বিশাল পরিকল্পনা জন্ম দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সে ইতিহাস বড় দীর্ঘ। সংক্ষিপ্ত পরিসরের এই বই সে বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার উপযুক্ত নয়।

অধম লেখকের দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন সাহেব (কুঃ সিঃ), হযরত গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ)এর পাগলপারা আশেক ছিলেন। মাদ্রাসার ছুটিকালীন সময়ে প্রায়ই ঐ খানকার আকর্ষণ তাঁকে দেওবন্দ থেকে পদব্রজে সেখান পর্যন্ত সফর করতে বাধ্য করত। কল্পনার চক্ষু এসব বুযুর্গকে এখানকার নূরানী মাজলিসে সমবেত দেখতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আমরা খানকা থেকে বিদায় গ্রহণ করে হযরত গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ)এর নাতী মাওলানা হাকীম মাসউদ আহমাদ সাহেব (মুঃ যিঃ)এর খেদমতে হাজির হই। খানকার পিছনেই তাঁর বাড়ী। হযরত মাওলানা অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করেন। আমার আজও স্মরণ আছে, আমার ওয়ালিদ মাজিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ)এর নিকট তাঁর জীবনের শেষ রোগাক্রান্ত অবস্থায় হযরত হাকীম সাহেবের একটি পত্র আসে। হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহঃ) সে সময় নিজে উত্তর লিখতে মাযুর ছিলেন। তাই অধমকে উত্তর লিখতে আদেশ করেন। অধমের উত্তর লিখতে কিছুটা গাফলতির কারণে আর কিছুটা ব্যস্ততার কারণে একদিন বিলম্ব হয়ে যায়। যা হোক, পরদিন হযরত ওয়ালিদ সাহেব উত্তরের কথা জিজ্ঞাসা করলে অধম জবাব দেই যে, 'এখনো উত্তর লিখতে পারিনি। আজকে ইনশাআল্লাহ লিখে দেব।' এতে তিনি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, 'আল্লাহর বান্দা! এই কাজটিকে তো সর্বপ্রধান মনে করা দরকার ছিল। তুমি জান না এটি কার চিঠি। আমার কি এত বড় সৌভাগ্য আছে যে হযরত গাঙ্গুহী (কুঃ সিঃ)এর নাতীর পত্র আমার নামে আসে।' এ কথা বলে তাঁর চক্ষুদ্বয়

অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

যদিও হযরত হাকীম সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত ওয়ালিদ সাহেবের নিকট পড়েছেন এবং তিনি নিজেকে হযরত ওয়ালিদ সাহেবের সাগরেদ বলতেন, কিন্তু হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)এর নেসবতে হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহঃ) তাঁর সঙ্গে নিজের ওস্তাদ ও শায়েখের মত আচরণ করতেন।

অল্প সময় তাঁর খেদমতে অতিবাহিত করে অন্তরে অপার্থিব এক ভাব ও আনন্দ নিয়ে দেওবন্দে প্রত্যাবর্তন করি। বাস্তবে আজকের এই দিনটি আমার এই সফরের আসল প্রাপ্তি ছিল। হারামাইন শারীফাইন (মক্কা, মদীনা) ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে গিয়েই সেই আনন্দ ও পুলক এবং তৃপ্তি ও শান্তি লাভ হয়নি, যা আল্লাহ তাআলা আজকের এই দিনে দান করেছেন। তাই আদি অন্তের প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরে

দেওবন্দের পরে একদিন সাহারানপুরেও যাওয়ার সুযোগ হয়। উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইলমের মারকায, মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসা দর্শনে ধন্য হই। আল্লাহর ফযলে হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব (মুঃ যিঃ)এর বরকতে এখানে এখনও আমাদের পূর্বকালীন বুযুর্গদের জীবন পদ্ধতির আভাস চোখে পড়ে। হযরত শাইখুল হাদীস সাহেব (মুঃ যিঃ)এর সাহেবজাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তালহা সাহেব এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শাহেদ সাহেব অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করেন। মাদ্রাসার আসাতেযায়ে কেরামের সঙ্গেও সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত হয়। মাদ্রাসার কুতুবখানাও পরিদর্শন করি। কিন্তু আফসোস সময়ের স্বল্পতার কারণে মন তৃপ্ত হতে পারেনি। কিন্তু অধমের জন্য এই অতি সংক্ষিপ্ত মোলাকাতও বিরাট বড় নেআমত।

দিল্লীর সফর

সাহারানপুরের পর দিল্লীতেও চার দিন অবস্থান করি। হযরত মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান সাহেব (মুঃ যিঃ)এর যিয়ারত ও

মোলাকাত লাভে ধন্য হই। জনাব কারী মুহাম্মাদ ইদরীস সাহেব (মুঃ যিঃ)এর নিকট অবস্থান করি। তাবলীগের মারকায নিযামুদ্দীনেও যাই। হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব এবং হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সাহেব (মুঃ যিঃ)এর মোলাকাত ও যিয়ারতের সৌভাগ্য হয়। হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (কুঃ সিঃ), হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতীয়ার কাকী (রহঃ) ও হযরত শাহ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দেহলভী (কুঃ সিঃ)এর মাযার যিয়ারতেরও সৌভাগ্য লাভ হয়। মুসলমানদের নাম করা ও প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আল জমিয়তের' সম্মানিত সম্পাদক জনাব নায আনছারীর সাথে পাকিস্তানেই সুসম্পর্ক হয়েছিল। তার অনুপম আচরণ ও মনোমুগ্ধকর কথার প্রভাব পূর্ব থেকেই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সদয় হয়ে এখানেও সাক্ষাত দানে ভূষিত করেন। বরং সদসালা এজলাস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'আল জমিয়তের' বিশেষ সংখ্যাও প্রদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি দারুল উলূম করাচী সম্পর্কে বিস্তারিত একটি প্রবন্ধ 'আল জমিয়তের' এক সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ আল বালাগের কোন এক সংখ্যায় অতিসত্বর তা নকল করে প্রকাশ করা হবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় আত্মীয় জনাব মাখমুর উসমানী, যিনি হামদর্দ দাওয়াখানার প্রচার সম্পাদক, দিল্লী অবস্থানকালে বিশেষ অনুগ্রহ করেন এবং বিদেশীদের যেসব জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলোতে সীমাহীন সহযোগিতা করেন। আল্লাহ পাক তাকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। এই সফরকালে দিল্লী, আগ্রা ও ফতেহপুরে মুসলমান সুলতানদের নিদর্শনাবলী, জামে মসজিদ, লালকেল্লা, তাজমহল আরও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানসমূহ শত আফসোস ও নৈরাশ্যের চোখে দর্শন করি এবং পাঁচদিন পর এখান থেকে ইলাহাবাদের দিকে যাত্রা করি।

শাহ অসীউল্লাহ সাহেবের খানকায়

ইলাহাবাদে কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাত এবং হযরত মাওলানা শাহ অসীউল্লাহ সাহেব (রহঃ)এর খানকাতে যাওয়ার তীব্র বাসনা ছিল। তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানভী (কুঃ সিঃ)এর প্রথম শ্রেণীর খলীফাদের অন্যতম। তিনি ইলাহাবাদে আপন শায়েখের পদ্ধতি

অনুযায়ী মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাহ ও ইরশাদের অত্যন্ত কল্যাণকর ব্যবস্থা করেছেন। এতে আল্লাহর বান্দাদের সীমাহীন উপকার হচ্ছে। তিনি মাদ্রাসা করার পূর্বে এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোন মাদ্রাসা বা আত্মশুদ্ধির কোন কেন্দ্র ছিল না। দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু বেদআত ও রুসুমের বাজার গরম ছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানার মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের যেই বিরাট কাজ নেন, তা বিস্ময়কর। শত শত মানুষের জীবনে বিপ্লব সাধিত হয় এবং অসংখ্য মানুষ দ্বীনের বিশুদ্ধ সমঝ (ধারণা) লাভের তাওফীক পায়। হযরত মাওলানা হেজাযের সফরকালে পথিমধ্যেই আখেরাতের পথযাত্রী হন। এমনকি তাঁর পবিত্র লাশ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়।

نہ کہیں جنازہ اُٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا

'কেহ জানাযা বহন না করত এবং কোথাও মাযার না হত।'

হযরত মাওলানা অসীউল্লাহ (কুঃ সিঃ)এর এজাযতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট খলীফা এবং তাঁর জামাতা হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ মুবীন সাহেব (মুঃ যিঃ) বর্তমানে এই খানকার তত্ত্বাবধায়ক। তার সঙ্গে আমার দেওবন্দেও সাক্ষাত হয়েছিল। খানকায় হাজির হলে তিনি সীমাহীন স্নেহ প্রদর্শন করেন। আলহামদুলিল্লাহ! মাদ্রাসা ও খানকা এখনো আবাদ রয়েছে এবং ইসলাহ ও তরবিয়তের ধারা চালু রয়েছে দেখে বড় আনন্দিত হই। হযরত মাওলানা (কুঃ সিঃ)এর অতীব তাছীরপূর্ণ মাওয়ায়েজ এবং মালফুজাত এখান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। 'অসীয়্যাতুল ইরফান' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও এখান থেকে বের হয়। যার বেশির ভাগ বিষয়বস্তু হযরত মাওলানা (কুঃ সিঃ)এর মুখনিঃসৃত জ্ঞানসম্ভার সম্বলিত। আলহামদুলিল্লাহ! খানকাটিতে কয়েকবার হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। আলেম-উলামা, নেককার এবং আল্লাহওয়ালাদের এই আসর দেখে এইভেবে তৃপ্তি লাভ হয়—

ابھی کچھ لوگ ہیں ساقی کی محفل دیکھنے والے

'এখনও এমন লোক রয়েছে, যারা সাকীর আসর প্রত্যক্ষ করেছে।'

হযরত মাওলানা শাহ অসীউল্লাহ সাহেব (কুঃ সিঃ)এর অপর একটি মারকায ছিল শহরের একটি মসজিদ। এটি ছোট মসজিদ নামে পরিচিত। আলহামদুলিল্লাহ! হযরতের আরেক জামাতা মাওলানা কামরুজ্জামান সাহেবের তত্ত্বাবধানে সেখানেও একটি মাদ্রাসা কর্মতৎপর রয়েছে। সেখান থেকেও হযরত মাওলানার ইরশাদ ও ফয়েয বিতরণ হচ্ছে। এখান থেকে 'মারেফাতে হক' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় হযরতের ইফাদাত (বাণীসমূহ) প্রকাশিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমার সেখানেও হাজির হওয়ার এবং সেখানে অন্যান্য আলেম ও সালেহগণের মাহফিল থেকে জ্ঞানলাভ করার সুযোগ হয়। তারাও যেই স্নেহ ও কৃপাপূর্ণ আচরণ করেন তার চিত্র অন্তরে অঙ্কিত রয়েছে। অধমের লক্ষ্ণৌ যাওয়ার প্রাক্কালে মাওলানা কামরুজ্জামান সাহেব এবং মাওলানা আম্মার সাহেব রাত চারটায় ষ্টেশনে এসে বিদায়কালে শুধু সাক্ষাত দানেই ধন্য করেননি, বরং সঙ্গে করে নাস্তার সামগ্রীও নিয়ে আসেন। যেগুলো আল্লাহর নেআমত তো বটেই উপরন্তু এমন পুণ্যবান, সুহৃদ ও স্নেহশীল লোকের হাতে থেকে পেয়েছি বলে এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাত

ইলাহাবাদ অবস্থানকালে আরেকটি মহান নেআমত যা অধম লাভ করি, তা হল হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব প্রতাপগড়ী দামাত বারাকাতুহুমের যিয়ারত ও মোলাকাত। হযরত মাওলানা (মুঃ যিঃ) এমন হাতেগোনা ব্যক্তিদের অন্যতম, যাঁদের কথা কল্পনা করলে বর্তমান যুগের আল্লাহওয়ালাদের স্বল্পতার অনুভূতি হ্রাস পায়। তিনি একজনের মধ্যস্থতায় হযরত শাহ ফজলে রহমান সাহেব গঞ্জে মুরাদাবাদী (কুঃ সিঃ)এর খলীফা হযরত শাহ সাহেবের খলীফাদের অন্যতম বুযুর্গ হযরত মাওলানা সাইয়েদ বদর আলী শাহ সাহেব (রহঃ) ছিলেন তাঁর শায়েখ। যাঁর ছোহবতে থেকে তিনি রিয়াযত মোজাহাদা করেন এবং আধ্যাত্ম সাধনার মঞ্জিল অতিক্রম করেন। এমন কি হযরত মাওলানা সাইয়েদ বদর আলী শাহ সাহেব (রহঃ) একবার বলেন যে, 'যদি আল্লাহ পাক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি এনেছো?' তাহলে আমি নিবেদন

করব, আহমাদ মিঞা (অর্থাৎ মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব প্রতাপগড়ী)কে এনেছি'। হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব (রহঃ) একদা হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ সাহেব গাঙ্গুহী (মুঃ যিঃ) (প্রধান মুফতী, দারুল উলূম দেওবন্দ)কে জিজ্ঞাসা করেন, 'বর্তমানে নকশবন্দীয়া ছিলছিলার শক্তিশালী নিছবাতের অধিকারী বুযুর্গ কে?' তখন মাওলানা মুফতী মাহমূদ সাহেব গাঙ্গুহী (মুঃ যিঃ), হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব (মুঃ যিঃ)এর নামই বলেন। তিনি সাহেবে নিসবাত আল্লাহর ওলী হওয়ার সাথে সাথে কবিতা রচনায়ও অতীব সূক্ষ্ম ও রুচিসম্পন্ন যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাব্য সমগ্র হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (মুঃ যিঃ) অতি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

অধম সায়্যিদী ও মুর্শিদী হযরত ডঃ আবদুল হাই সাহেব (মুঃ যিঃ) ও হযরত বাবা নাজম আহসান সাহেব (রহঃ)এর নিকট তাঁর আলোচনা বহুবার শুনেছি এবং তখন থেকেই তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহ অন্তরে বিরাজ করছিল। আল্লাহর মেহেরবানীতে এই সফরে তা পূর্ণ হয়। হযরত মাওলানা প্রতাপগড়েই বসবাস করেন। তবে ইলাহাবাদ খুব বেশি যাতায়াত করেন। অধমের শ্রদ্ধেয় শ্বশুর শরাফাত হুসাইন সাহেব (মুঃ যিঃ) আল্লাহর মেহেরবানীতে বুযুর্গদের সাক্ষাতের কোন সুযোগই হাতছাড়া করেন না। তিনি আমাকে বলেন যে, হযরত মাওলানা বর্তমানে ইলাহাবাদেই অবস্থান করছেন। সুতরাং আমি তার সঙ্গে হযরত মাওলানার খিদমতে হাজির হই। যে কয়টি মুহূর্ত তাঁর সোহবতে কাটানোর সৌভাগ্য হয়, নিঃসন্দেহে তা জীবনের স্মরণীয় নেআমতসমূহের অন্যতম।

আমাদের বুযুর্গদের সরলতা, অকৃত্রিমতা আচরণ, বিনয়, আব্দিয়্যাত, আত্মবিলুপ্তি, প্রেম জ্বালা, জাঁকজমক ও আড়ম্বরহীনতা, আপাদমস্তকে মূর্তিমান স্নেহ ও রহমত এবং আগমনকারীদেরকে দ্বীনের কথা শোনানোর সেই মগ্নতা সবই সেখানে বিদ্যমান। নেই কেবল নামকরা বাতিল পীরদের ঠাটবাট ও কপট দরবেশদের কৃত্রিমতা। হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহঃ) এবং সায়্যিদী ও মুর্শিদী হযরত ডঃ আবদুল হাই সাহেবের

নিসবাতে এই অধমের সাথে তিনি অপরিসীম কৃপা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করেন। আমরা যখন যাই, তখন তাঁর শরীর ভাল ছিল না। তারপরও খুব খুশীমনে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলেন। অনেক দামী দামী নসীহত করেন। আলহামদুলিল্লাহ! এ সময় দুই দুইবার হযরতের খিদমতে হাজির হই। তার আপাদমস্তক বরকতপূর্ণ ব্যক্তিত্ব চিরদিনের জন্য আমার নয়ন মনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তাআলা হযরতকে পরিপূর্ণ আফিয়াতের সাথে জীবিত রাখেন এবং আমাদেরকে তাঁর থেকে ইস্তিফাদা করার তাওফীক দান করেন, আমীন।

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায়

ইলাহাবাদের পর লক্ষ্ণৌতে একদিন অবস্থান করি। লক্ষ্ণৌ সফরের উদ্দেশ্য ছিল দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার যেয়ারত এবং হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব ও হযরত মাওলানা মনযূর নোমানী সাহেব (মুঃ যিঃ)এর সাহচর্য ও যিয়ারত দ্বারা উপকৃত হওয়া। মুহতারাম ভাই মাওলানা বুরহান সাম্ভলী সাহেব (মাজলিসে তাহকীকাতে শারইয়া'এর নাযেম এবং দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার তাফস্বীর ও হাদীসের উস্তাদ) মেহেরবানী করে ষ্টেশন থেকে পথ দেখিয়ে আমাকে দারুল উলূমে নিয়ে যান। সেখানে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ খান সাহেব (পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান) আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন। দুপুরে খানা খাওয়ার সময় সেখানে আলেমদের বেশ বড় সমাবেশ হয়ে যায়। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ খান সাহেব (মুঃ যিঃ)এর সঙ্গে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী সাহেব (মুঃ যিঃ) সেখানে তাশরীফ আনেন। ফলে আমি পৌঁছতেই হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। হযরত মাওলানা আলী মিঞা (মুঃ যিঃ) তখন রায়বেরেলী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যখন দেওবন্দে সাক্ষাত হয়, তখন আমি আমার লক্ষ্ণৌ আসার কথা তাঁকে জানাই। আমার পোক্ত ইরাদা ছিল যে, লক্ষ্ণৌ থেকে রায়বেরেলী গিয়ে হযরত মাওলানার খিদমতে হাজির হব। কিন্তু প্রবাদ রয়েছে—

عرفت ربى بفسخ العزائم

'বারবার সংকল্প ভাঙ্গার দ্বারাই আমি আমার রবের পরিচয় লাভ করেছি।'

সেমতে অবশ্যম্ভাবী কয়েকটি কারণে অধমকে সত্বর পাকিস্তান ফিরতে হয় এবং লক্ষ্ণৌতে একদিনের বেশি অবস্থান করার সুযোগ হয়নি। সেই একদিনও অফিসিয়াল কাজকর্ম এবং সিট বুক করা ও অন্যান্য কাজে ব্যয় হয়ে যায়। অধম রায়বেরেলী যাওয়া থেকে মাহরুম হই এবং হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব (মুঃ যিঃ)এর খিদমতে হাজির হওয়ার বাসনা অপূর্ণ রয়ে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ! তারপরও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা এবং সেখানকার ফাযেল উস্তাদগণ ও আহলে ইলমদের সংক্ষিপ্ত সোহবাত নসীব হয়। নদওয়ার মত ইলমী মারকায ইতিপূর্বে আমার দেখা হয়ে উঠেনি। আলহামদুলিল্লাহ! আজকে তার যিয়ারত লাভ করি। এর বিশাল কুতুবখানা দেখার সুযোগ হয়। মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ (রহঃ)এর হস্তলিপি কপি এখানেই প্রথমবার দেখতে পাই। আরও অনেক দুর্লভ কিতাব দেখার সুযোগ হয়।

নদওয়ার ইলমী ও দ্বীনী পরিবেশ দেখে অনেক আশা জাগল এবং সাহস বৃদ্ধি পেল। 'নদওয়া' আকবার মরহুমের উক্তি অনুযায়ী 'বিচক্ষণ রসনা' তো সর্বদা ছিলই কিন্তু 'প্রেম বেদনাপূর্ণ হৃদয়ের যেই স্বল্পতার কথা ব্যক্ত করা হত, তা হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব (মুঃ যিঃ) দূর করে দিয়েছেন। বিশেষ করে মাওলানা আলী মিঞা (মুঃ যিঃ)এর চিন্তা ও দুরদৃষ্টি, সাধনা ও প্রচেষ্টা এবং প্রেম বেদনার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে চোখে পড়ে। মনে হচ্ছিল যেন হযরত মাওলানা (মুঃ যিঃ) প্রতিষ্ঠানটিকে নবজীবন দান করেছেন। স্বল্প সময়ে এখানে যা কিছু দেখলাম এবং যেসব উস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হল, আলহামদুলিল্লাহ! তার আলোকে এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক কিছুর আশা পোষণ করি এবং জীবনের বিভিন্ন শাখায় দ্বীনী খিদমতের ভবিষ্যত আলোকময় দেখতে পাই। আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানা (মুঃ

যিঃ)এর উদার অস্তিত্বকে মুসলমানদের উপর দীর্ঘদিন অবশিষ্ট রাখুন। তাঁর অধীনে এ প্রতিষ্ঠানকে অধিক উন্নতিতে ভূষিত করুন এবং এর পবিত্র নিদর্শনাবলী অন্যান্য দ্বীনী ও ইলমী প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিন। আমীন।

পরদিন সকালে নাস্তার বৈঠকে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী সাহেব (মুঃ যিঃ)এর খেদমতে হাজির হই। হযরত মাওলানার ব্যক্তিত্ব পরিচয় দানের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর লেখনী ও তাবলীগী খেদমত দ্বারা গোটা উপমহাদেশ উপকৃত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ইলম ও আমলের এত সব উৎকর্ষতার সাথে সাথে বিনয় ও নিঃস্বার্থতার যেই দৌলত তাঁকে দান করেছেন, তার দৃষ্টান্ত কালেভদ্রেই দেখা যায়। তিনি দেওবন্দের সদসালা এজলাসে যেতে পারেননি। তাই লক্ষ্ণৌ না গেলে তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত হতে হত। আল্লাহর মেহেরবানীতে লক্ষ্ণৌ সফরের আমার এ উদ্দেশ্যও হাসিল হয়। প্রায় দুই আড়াই ঘন্টা সময় হযরত মাওলানা (মুঃ যিঃ)এর সাহচর্যের সম্মান লাভ করি। অনেক জরুরী বিষয় জানতে পারি। তিনি তাঁর নতুন মুদ্রিত কিছু গ্রন্থ হাদিয়া হিসেবে দান করেন। এ সকল বুযুর্গের সোহবতের এ ফায়েদাটুকু তো আমরা লাভ করি যে, তাঁদের জীবন আমাদের মত লোকদের জন্য মূর্তিমান এক শিক্ষা। তাঁদের সরলতা, বিনয়, অনুপম আদর্শ, আত্মার মনিকোঠায় সুপ্ত প্রেমজ্বালা এবং দ্বীনের পথে তাদের মেহনত দেখে ন্যূনতম পক্ষে এতটুকু লজ্জার উদ্রেক হয় যে, এ সকল হযরত তো আর অনেক পূর্বের নন। এঁরা এই যুগেরই লোক, যে যুগে আমরা জীবন ধারণ করছি। ফলে কোন না কোনভাবে তাঁদের অনুরূপ হওয়ার প্রেরণা কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়। এই প্রেরণা বারবার জাগ্রত হতে থাকলে এতে একসময় দৃঢ়তা লাভ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই তো বলা হয়—

یک زمانہ صحبتے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

'মুহূর্তকাল আল্লাহ ওয়ালাদের ছোহবত
রিয়ামুক্ত শত বছরের ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।'

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী ছাহেব (মুঃ যিঃ)এর খেদমতে লক্ষ্ণৌ অবস্থানের উৎকৃষ্টতম সময় অতিবাহিত করার পর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করি এবং সেদিনই জুমুআর পর অমৃতস্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

পঁচিশ দিনব্যাপী হিন্দুস্তানের এই সফর অধমের জন্য নানাপ্রকার কল্যাণে পরিপূর্ণ ছিল। যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে করেছি। পরিশেষে প্রতিবেশী দেশ এবং পনের কোটি মুসলমানের মাতৃভূমি হিসেবে সেখানকার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরছি।

ভারতে এমন কিছু প্রশংসাযোগ্য বিষয় আমার দৃষ্টিগোচর হয়, যা পাকিস্তানের লোকদের জন্য শিক্ষণীয়। যেমন ভারতের যেসব অঞ্চলে আমি গিয়েছি সেসব অঞ্চলের লোকদের মধ্যে বাহ্যিক জাঁকজমক ও আড়ম্বর আমাদের তুলনায় কম মনে হয়েছে। ভারত সরকারের ভিনদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের উপর সীমাবদ্ধতা যতদূর সম্ভব হ্রাস করা এবং দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রসার ঘটিয়ে বিভিন্ন শিল্পসামগ্রীতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই রয়েছে। ফলে আজ সেখানে শুধু গাড়ীই নয়, বরং বিমান ও ট্যাংক পর্যন্ত তৈরী করা হচ্ছে। সেখানকার বাজারে ভিনদেশী শিল্পজাত দ্রব্য কদাচিত চোখে পড়ে। গোটা দেশে এমন গাড়ী আপনার চোখে খুব কমই পড়বে, যা বাহির থেকে আমদানী করা হয়েছে। দেশের সব জায়গায় ভারতের তৈরী একই গাড়ী ব্যবহার হচ্ছে। দেশের ধনী ও শাসক শ্রেণী থেকে নিয়ে নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত সকলেই সেই গাড়ী ব্যবহার করছে। সড়কে গাড়ী কম এবং রিক্সা প্রভৃতিই বেশি দেখা যায়। জীবন যাপনে সরলতাই বেশি এবং টিপটপ তুলনামূলকভাবে কম। এতদব্যতীত এ বিষয়টি স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, সরকার জনসাধারণের মধ্যে যে ধরনের জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী ছিল তাতে তারা বিশেষ সফলতা লাভ করেছে। সেখানকার লোকদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং অন্য দেশের উপর স্বদেশকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা সকল নাগরিকের মধ্যেই পাওয়া যায়। হিন্দী ভাষা ভারতের অধিকাংশ

নাগরিকের নিকট অপরিচিত হলেও বর্তমানে তার ব্যাপক প্রচলন চোখে পড়ে এবং এর দ্রুত বিস্তার ঘটাতে সরকার বিরাট সফলতা লাভ করেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এসব প্রশংসনীয় বিষয়ের যে কল্যাণকর ফলাফল জনসাধারণের জীবনে প্রকাশ পাওয়া দরকার ছিল, তা মোটেই দেখা যায় না। বরং ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টা দেখা যায়। যেমন স্বনির্ভর হওয়ার ফলে জনসাধারণের সচ্ছল হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। পাকিস্তানের তুলনায় সেখানে অধিক দারিদ্রতা চোখে পড়ে। হাতে গোনা কিছু অঞ্চল ছাড়া সচ্ছলতার সজীবতা তাদের চেহারায় দেখা যায় না। বরং উল্টো তাদের মুখমণ্ডল দরিদ্রতার প্রকোপে নির্জীব ও মলিন দেখা যায়। এমনিভাবে জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধের দাবী ছিল যে, সেখানে ঘুষ, অপরাধ, নৈরাজ্য ও দুর্নীতি কম হবে। কিন্তু এসব ব্যাপারে হিন্দুস্তান আমাদের দেশ থেকে কয়েক ধাপ আগে হতে পারে কিন্তু পিছিয়ে নেই কোনভাবেই। দ্রব্যমূল্য পাকিস্তান থেকে কিছু কম হলেও পারিশ্রমিকের মান সে তুলনায় আরও অধিক কম। মোটকথা উল্লেখিত প্রশংসনীয় বিষয়ের উৎকৃষ্ট কোন ফল বাস্তব জীবনে স্পষ্ট দেখা যায় না।

ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, তাদের এই সাহস শত বার ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য যে, তারা প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে টিকিয়ে রাখতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষত সেখানকার কিছু আলেম মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দান এবং তাদের আগলে রাখার জন্য বিরাট কুরবানী দিচ্ছেন। যার ফলে সেখানে অবস্থান করে দ্বীনের যতটুকু হেফাজত করা সম্ভবপর ছিল আলহামদুলিল্লাহ তারা সে ব্যাপারে অনেকাংশে সফল।

কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক এ সকল প্রচেষ্টার মোকাবেলায় সমস্যার যেই বন্যা মুসলমানদেরকে বিপরীত দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা অনেক বেশি মারাত্মক। ভারতের সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে আল্লাহ রাসূলের নাম থাকার যে প্রশ্নই নাই, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বরং এর বিপরীত খোদাদ্রোহী চিন্তা চেতনার বিষ গলধকরণ করানো হচ্ছে। উর্দূর

বীজ খতম করা হয়েছে। অনেক শহরে দীর্ঘপথ চলার পরও উর্দু লেখা কোন সাইনবোর্ড কমই চোখে পড়ে। হস্তলিপি পাল্টে দিয়ে নতুন প্রজন্মের সম্পর্ক অতীতের উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নতুন প্রজন্মের মধ্যে এমন তরুণদের সংখ্য দৈনন্দিন কমে যাচ্ছে, যারা উর্দুতে লিখতে এবং পড়তে জানে। রেডিও ও টেলিভিশনে ধর্মীয় কোন প্রোগ্রাম হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না, একথা বলাই বাহুল্য।

অপরদিকে হিন্দী ফিল্ম, পুস্তক ও পত্র–পত্রিকা নগ্নতা ও অশ্লীলতায় ইউরোপ আমেরিকার সাথে প্রতিযোগিতা করে চলছে। ফলে একজন ভদ্র লোকের জন্য কোন বুক ষ্টলের সম্মুখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ানোও অসম্ভব। পাকিস্তানেও আমরা নগ্নতা ও অশ্লীলতার জন্য দিন রাত অশ্রু বিসর্জন করছি। নিঃসন্দেহে এ অভিশাপে আমরাও আক্রান্ত। তবে বাস্তব এই যে, এ ব্যাপারে পাকিস্তান হিন্দুস্তানের ধারে কাছেও পৌছতে পারবে না। মদ পানির মত প্রবাহিত হচ্ছে। দরিদ্র লোকেরা পর্যন্ত এই কুঅভ্যাসে আক্রান্ত। দায়িত্বশীল এক হিন্দু অফিসারের সঙ্গে আলাপচারিতার মাঝে অধম জিজ্ঞাসা করি যে, 'অনেক বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ভারতে দরিদ্রতা এত প্রকট কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এ দেশে মদপান মহামারী আকারে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। এই মহামারী বিদ্যমান থাকতে এখানকার লোকেরা যত বেশিই উপার্জন করুক না কেন তাদের দরিদ্রতা দূর হতে পারে না।'

তাছাড়া অত্যন্ত দুঃখজনক ও মারাত্মক একটি বিষয় এই যে, হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় স্বকীয়তা ক্রমশ মারাত্মকভাবে লোপ পাচ্ছে এবং একে বিলুপ্ত করার নিয়মতান্ত্রিক ও সুসংহতভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এমনকি পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে যে, এখন মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে বিবাহের ঘটনা পর্যন্ত ঘটছে। এলাহাবাদের একজন মুসলমান ছাত্রী আমাকে বলেছে যে, মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ হলে সরকার এজন্য তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকে। একে 'ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহের পুরস্কার' (Inter Caste Marriage Prize) বলা হয়।

আমরা পাকিস্তানে বাস করেও নিজেদের পরিবেশের ধর্মীয় ত্রুটি এবং

অধর্মের ক্রমবর্ধমান সয়লাবের সকাল–সন্ধ্যা অভিযোগ করে থাকি। কিন্তু সত্য কথা এই যে, হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থা এবং মুসলমানদের পরিস্থিতি কাছ থেকে দেখার পর আমার নিকট পাকিস্তানের মূল্য ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এখন উপলব্ধি করতে পারি যে, এ দেশ আমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত কত বড় নেআমত।

যদি আমরা নিষ্ঠা, এখলাস, প্রেরণা ও মনোযোগ সহকারে আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে এটি গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠতম ভরসাস্থল হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা এখানে এমন অনেক মুসীবত থেকে নিরাপদ আছি, যা হিন্দুস্তানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলার এই নেআমতের শুকরিয়া এই যে, যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ দেশ অস্তিত্ব লাভ করেছে, আমরা সে উদ্দেশ্য পুরা করব। যেসব অন্যায় অপকর্ম আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ডেকে আনে, আমরা সেগুলোর মূলোৎপাটন করব এবং এই দেশকে ধর্মীয় দিক থেকে একটি আদর্শ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে এদেশে আমরা কোন অমুসলিম সরকারের হাতে জিম্মি ও আবদ্ধ নই, বরং আমাদের গোটা জীবন ব্যবস্থাকে আমাদের ধর্ম মোতাবেক পুরোপুরি সাজাতে চাইলে আমরা তা করতে পারি। আর যদি আমরা এই নেআমতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ হই এবং আল্লাহ প্রদত্ত এই সুযোগের সৎ ব্যবহার না করি, তাহলে আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই নেআমতের মর্যাদা বোঝার এবং তার হক আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দক্ষিণ আফ্রিকার দুই সফর

প্রথম সফর ঃ যিলহজ্জ ১৪০০ হিজরী, নভেম্বর ১৯৮০ ঈসায়ী
দ্বিতীয় সফর ঃ যিলহজ্জ ১৪০১ হিজরী, সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ঈসায়ী

প্রথম সফর

দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের পক্ষ থেকে অনেক দিন ধরে আমার শ্রদ্ধেয় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী সাহেব উসমানী এবং এই অধমকে সেদেশ ভ্রমণে পীড়াপীড়ি করা হচ্ছিল। কিন্তু বিগত দিনগুলোতে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে সে নির্দেশ পালনের সুযোগ হয়ে উঠেনি। অবশেষে ২২শে যিলহজ্জ ১৪০০ হিজরী মোতাবেক ২রা নভেম্বর ১৯৮০ ঈসায়ীতে সফরের সুযোগ হয়। প্রায় দশ ঘন্টা আকাশ ভ্রমণের পর কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে রাত্রি কাটাই। ৩রা নভেম্বর সকালে বৃটিশ এয়ারওয়েজে সেখান থেকে রওয়ানা করে দুপুর সাড়ে বারটায় জোহান্সবার্গে পৌঁছি। বিমান বন্দরে বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মুসলমান ও বিপুল সংখ্যক উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। জোহান্সবার্গ থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরের আজাদবেল অঞ্চলে জনাব আহমাদ হাসান লহর সাহেবের বাড়িতে আমরা অবস্থান করি।

দক্ষিণ আফ্রিকা বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী। আল্লাহ পাক এ অঞ্চলকে খনিজ ও কৃষি উপকরণে সমৃদ্ধশালী করেছেন। এখানে স্বর্ণ, প্লাটিনাম, রূপা ও ইউরোনিয়ামের খনি রয়েছে। বলা হয় যে, বিশ্বের প্রায় তিন–চতুর্থাংশ স্বর্ণ এই দেশ থেকে উত্তোলন করা হয়। জলবায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও কৃষি উৎপাদনের দিক থেকেও ভূখণ্ডটি বিশ্বের বিশিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে গণ্য হয়। দেশটি মূলত বিভিন্ন আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল। পরে ইংরেজরা এটি দখল করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘদিন পর ডাচ জাতি তরবারী দ্বারা ইংরেজদের হাত থেকে দেশটি ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে শাসন প্রতিষ্ঠা করে। যা অদ্যাবধি চলে আসছে। ফলে রুডেশিয়া (বর্তমান জিম্বাবুয়ে) স্বাধীন হওয়ার পর সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের মধ্য থেকে একমাত্র এই দেশটি শ্বেতাঙ্গদের দখলাধীন রয়েছে। যেখানে এখনো পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। শাসক জাতি দেশটিকে নগরায়ন ও শিল্পের দিক থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার মানে উত্তীর্ণ করতে যেই পরিমাণ চেষ্টা চালিয়েছে, তা অন্য কোন দেশে পাওয়া

যায় না। সুতরাং এখানকার বড় শহর জোহান্সবার্গ, টেরিটোরিয়া ও ডারবান নাগরিক সুবিধা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে লণ্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে অগ্রগামী হলেও হতে পারে, কিন্তু পিছিয়ে নেই কোনভাবেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী

দেশটি চারটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত। ট্রান্সুয়াল, নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ও কেপ প্রাভেন্স। এর মধ্যে অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট শ্বেতাঙ্গদের প্রদেশ হিসেবে নির্ধারিত। সেখানে অন্য কোন জাতির বসবাসের অনুমতি নেই। অবশিষ্ট তিন প্রদেশে পাঁচটি জাতির বাস রয়েছে।

১. শ্বেতাঙ্গ, যারা দেশের ক্ষমতাসীন জাতি। এদের মধ্যে ইহুদী এবং খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে।

২. কৃষ্ণাঙ্গ, যারা এ দেশের প্রকৃত বাসিন্দা এবং এরাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু অধিকারের দিক থেকে তারা এই দেশের নিপীড়িত সম্প্রদায়। এদের বেশির ভাগই খৃষ্টান।

৩. কালার্ড, অর্থাৎ রঙ্গিন সম্প্রদায়, যারা শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে।

৪. ইণ্ডিয়ান, যারা মূলত হিন্দুস্তানের অধিবাসী, তবে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এখানকার বাসিন্দা হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ বোম্বাই, সুরাট ও গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের লোক। মাদ্রাজ ও কেরালার হিন্দুরাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। তবে এদের মধ্যে বেশির ভাগই মুসলমান। পঞ্চম সম্প্রদায়টিকে মালই বলা হয়। এরা মূলত মালদ্বীপের অধিবাসী। যে সময় ইংরেজ একই সাথে মালদ্বীপ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্ষমতাসীন ছিল, সে সময় তারা মালদ্বীপের কিছু মুসলমানকে বন্দীরূপে এখানে পাঠিয়ে দেয়। তাদের থেকে এই বংশধারা জন্ম নেয়। এদের বেশিরভাগ মুসলমান এবং বিরাট সংখ্যক লোক কেপ প্রাভেন্সের অধিবাসী।

দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা

আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিল ইণ্ডিয়ান মুসলমানগণ। এরা বেশির ভাগ গুজরাট ও সুরাটের আশপাশের লোক। এদের পিতা ও পিতামহগণ

কোন এক সময় দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিজেদের বাসস্থান বানায়। এরা মৌলিকভাবে নেহায়েত দ্বীনদার। আলেম এবং আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধর্মের প্রতি এদের মধ্যে বিপুল অনুরাগ রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পূর্ণ পরিবেশ কুফরী ও পাপ পঙ্কিলতার নিঃসীম অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু এরা কঠোর মুজাহাদা করে এবং উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এই প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের ধর্মীয় স্বকীয়তা এবং ধর্মভিত্তিক জীবনধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কোশেশ করেছে। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক নিজেদের ধর্মীয় মর্যাদা এবং ধর্মীয় দৃঢ়তার ক্ষেত্রে সম্ভবত অনেক ইসলামী দেশের সাধারণ মুসলমানদের থেকেও অগ্রগামী। এ দেখে আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ও জাগল যে, এমন নির্ভেজাল পশ্চিমা পরিবেশে এখানকার মুসলমানদের অধিকাংশের মধ্যে 'রুখছাত' (ছাড়ার অনুমতি)এর পরিবর্তে 'আজিমাত' (মূল আদেশ)এর উপর আমল করার ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় প্রেরণা দেখা যায়। এ বিষয়ে চিন্তা করলে বাহ্যিকভাবে এর একটি মাত্র কারণই বুঝে আসে, আর তা এই যে, এরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস শুরু করার পরও হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের বড় বড় আলেম ও বুযুর্গের সঙ্গে অনবরত সম্পর্ক রেখেছেন। এখানকার বেশির ভাগ মুসলমান চিঠিপত্রের মাধ্যমে হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের কোন না কোন বুযুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তাঁদের দ্বারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের কাজ চালু রেখেছেন।

এতদব্যতীত তাঁরা উপমহাদেশের আলেম ও বুযুর্গদেরকে অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে দাওয়াত করে এদেশে এনে সারা দেশে তাদের ওয়াজ ও বিশেষ মজলিসের ব্যবস্থা করে থাকেন। সে সকল মজলিসে বিপুল সংখ্যক মুসলমান দলে দলে অংশগ্রহণ করে থাকে। হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব (রহঃ), অধমের শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ), হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব বিননূরী (রহঃ), হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেব থানভী (রহঃ), হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব (মুঃ যিঃ), হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী (মুঃ যিঃ) বিভিন্ন সময়ে এখানে সফর করতে থাকেন। তাঁদের ফয়েয ও বরকত

এখানে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে কিছুদিন ধরে তাবলীগ জামাতের কাজও এখানে অনেক বিস্তার লাভ করেছে। যে কারণে এখানকার পরিবেশে অধিক উত্তম পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তাবলীগ জামাআতের কাজে অনেক বড় ফল দেখা দিয়েছে। বর্তমানে গ্রামে গ্রামে এই পবিত্র কাজ বিস্তার লাভ করছে।

আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে অধমের শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (কুঃ সিঃ) এখানকার এক দীর্ঘ ভ্রমণ করেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে দেড় মাসের সেই সফরের বিস্ময়কর প্রভাব এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সফরের বদৌলতে না জানি কত মানুষের জীবনে বিপ্লব সাধিত হয়। কত পথহারা মানুষ দ্বীনের পথে চলে আসে। কত জনের হৃদয় জগত পরিবর্তিত হয়। পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত কত মানুষ চিরতরে তাওবা করে জীবন শুধরে নেয়। এমন লোক এখনও সেখানে বিদ্যমান, যারা স্পষ্ট বলে থাকে যে, আমাদের জীবন হযরত মুফতী সাহেবের (কুঃ সিঃ) জীবন্ত কারামত। পরবর্তীতে তাদের মধ্য থেকে বিরাট সংখ্যক লোক অব্যাহতভাবে চিঠিপত্রের মাধ্যমে হযরত ওয়ালিদ সাহেবের সাথে যোগাযোগ রাখে এবং তাঁর সঙ্গে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের কাজ চালু রাখে। তাদেরই কয়েকজন আমাদেরকে দাওয়াত করেন।

এক মাসের এই সফরকালে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই প্রদেশ 'ট্রান্সুয়াল' ও 'নাটালের' বিশোর্ধ শহরে যাওয়ার সুযোগ হয়। তার মধ্য থেকে জোহান্সবার্গ, প্রিটোরিয়া, কার্ভগ্রোস ডরুপ, লিনিশিয়া, রেষ্টমান বার্গ, রশনী, বননী, মডেল বার্গ, বার্বাটোন, নেলসপোর্ট, হেক পোর্ট, বৃটিয, ডারবান, পেট্রিমিরাটয বার্গ ও টোঙ্গা প্রভৃতির নাম এ সময় স্মরণ রয়েছে। আর অনেক শহরের নাম মনে নেই। অনেক স্থানে শ্রদ্ধেয় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী সাহেব উসমানী অথবা অধমের সাধারণ সমাবেশে এবং বিশেষ বৈঠকে বক্তব্য দানের সুযোগ হয়। প্রায় সব জায়গায় মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনা এবং তাদের আবেগ দেখার মত ছিল। অনেক মানুষ ওয়াজ শোনার জন্য একশ–দেড়শো কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে আসে এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন দ্বারা

তাদের দ্বীনের পিপাসা অনুমিত হয়।

কিছুদিন ধরে সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে একটি উদ্বেগজনক সমস্যা এই দেখা দিয়েছে যে, সেখানকার তরুণ যুবকরা ক্রমান্বয়ে উর্দূ ও গুজরাটি ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হতে চলেছে। পরিবারের সাধারণ ভাষা ইংরেজী হয়েছে। সন্তান জন্ম হওয়ার পর মা বাবাও তার সাথে ইংরেজীতে কথোপকথন করে থাকে। যে কারণে শিশুদের মাতৃভাষা হয়েছে ইংরেজী। তারা উর্দূ বা গুজরাটি ভাষা বোঝে না। আর যেহেতু ঐসব অঞ্চলের মুসলমানদের পর্যন্ত ধর্মীয় জ্ঞান পৌছার পথই ছিল উর্দূ বা গুজরাটি ভাষা, তাই বর্তমানে যে নতুন প্রজন্ম প্রবৃদ্ধি লাভ করছে, তারা ধর্মীয় জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির সাথে সমন্বয়ের জন্য বর্তমানে সেখানকার আলেমগণও মসজিদসমূহে ইংরেজীতে ভাষণ প্রদান করতে শুরু করেছেন এবং মক্তব মাদ্রাসাসমূহের পাঠদানও ইংরেজীতেই শুরু হতে চলেছে।

সাধারণত মসজিদে এশার নামাযের পর আমাদের ভাষণ হয় এবং তার বেশির ভাগই হয় উর্দূতে। কিন্তু কিছু তরুণ ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, যে সকল লোক উর্দূ ওয়াজ পুরাপুরি বোঝে না, তাদের জন্য ইংরেজীতে পৃথক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক। বিধায় অনেক শহরে আসর নামাযের পর এসব তরুণদের জন্য পৃথক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে অধম ইংরেজীতে ভাষণ দান করি। ভাষণ শেষে মাগরিব পর্যন্ত প্রশ্ন উত্তরের ধারা চালু থাকে। অধম যদিও ইংরেজী সম্পর্কে ধারণা রাখি, কিন্তু ইংরেজীতে উপস্থিত সাবলীল ভাষণ দানে অভ্যস্ত নই। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে এই পরীক্ষা বরণ করে নেই। আর এটি সেখানকার লোকদের ধর্মীয় আবেগের বরকত এবং তাদের নিখাদ চাহিদার প্রকাশ ছিল যে, তারা অধমের এই ভাঙ্গাচুরা আলোচনা শুধু সহ্যই করেনি বরং অধমের সাহস বৃদ্ধিও করেছেন।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী সাহেব (মুঃ যিঃ) সাধারণ সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করা ছাড়াও প্রায় সব জায়গায় খাছ মজলিসসমূহেও ভাষণ দান করেন এবং তাতে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (কুঃ সিঃ), হযরত ওয়ালিদ সাহেব

(রহঃ) এবং আমার মুর্শিদ হযরত মাওলানা ডঃ আবদুল হাই সাহেব (রহঃ)এর বাণী ও বক্তব্য শুনানোর ধারা চালু রাখেন। আলহামদুলিল্লাহ! এতে অনেক ফায়দা হয়। এছাড়া বিভিন্ন শহরে মহিলাদের অনেকগুলো সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং সেখানকার পরিস্থিতির উপযোগী অত্যন্ত ফলপ্রসূ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। আলহামদুলিল্লাহ! এর ভাল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়।

সফরের শেষ দিকে জমিয়তে উলামায়ে ট্রান্সুয়ালের পক্ষ থেকে জোহান্সবার্গের নিউ টাউন মসজিদে আলেমদের একটি বিশেষ সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়। এতে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় চল্লিশ জন আলেম অংশগ্রহণ করেন। এই মজলিসে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বীনী, তাবলীগি ও ফেকাহ সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে মূল্যবান মত বিনিময় হয়।

*

পূর্বে ইণ্ডিয়ান লোকেরা শ্বেতাঙ্গদের শহরসমূহে একত্রে বসবাস করত। কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার 'গ্রুপ এরিয়া এ্যাক্ট' নামে নতুন আইন চালু করে। এই আইনের ভিত্তিতে প্রত্যেক বড় শহরের সাথে ইণ্ডিয়ানদের জন্য পৃথক শহর প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই আইনের ফলে কোন ইণ্ডিয়ান শ্বেতাঙ্গদের শহরে বাস করতে পারবে না। ফলে ইণ্ডিয়ান লোকেরা নিজেদের বাপ-দাদার বাড়ী বিক্রি করে নতুন শহরগুলোতে বাড়ী তৈরী করতে বাধ্য হয়। কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বসতি স্থানান্তরের এই কাজ বর্তমানে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং প্রত্যেক বড় শহর থেকে কিছু দূরে একটি করে ইণ্ডিয়ান শহর আবাদ হয়েছে। যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার শুধুমাত্র ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকেরা বাস করছে।

বসতি স্থানান্তরের কাজটি প্রথম দিকে তো তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়। কারণ, অনেক বছর ধরে বসবাসকারী এই সকল লোক উক্ত আইনের ভিত্তিতে নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে আসতে এবং নতুন করে ঘরবাড়ী নির্মাণ করতে বাধ্য হয়। তবে ধর্মের দিক থেকে এই কাজের

পরিণতি মুসলমানদের জন্য কল্যাণকরই প্রমাণিত হয়। ইণ্ডিয়ান লোকদের বেশির ভাগই মুসলমান। তাই পৃথক এই বাসস্থানে তাদের জন্য ইসলামী প্রতীক এবং ইসলামী শিষ্টাচার ও সামাজিকতা রক্ষা করা অধিক সহজ হয়। মিশ্রিত জনবসতিতে শ্বেতাঙ্গদের মেলামেশার কারণে মুসলমানদের সন্তানদের ধর্মীয় ভবিষ্যৎ বিপদের সম্মুখীন ছিল। পৃথক জনবসতি হওয়ার কারণে মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মীয় প্রতীকসমূহ অধিক গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করতে পারবে। শিশুদের প্রতিপালনও তুলনামূলক সহজ হয়েছে। এখানে মুসলমানগণ যেই আলিশান ও জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদসমূহ নির্মাণ করেছেন, অনেক মুসলিম দেশেও এমন পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর মসজিদ পাওয়া যাবে না। এটি আল্লাহ পাকের ফজল আর করম যে, এসব মসজিদ শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের দিক দিয়েই উন্নত নয়, বরং সেগুলো আলহামদুলিল্লাহ নামাযীদের দ্বারাও পূর্ণ থাকে। শুধুমাত্র বর্ষিয়ানরাই নয়, বরং তরুণ ও যুবক ছেলেরাও মসজিদে আসে। সেখানে তাবলীগের সমাবেশ হয়। এশার পর তাবলীগী নিসাবের সম্মিলিত পাঠ চলে। ধর্মীয় তৎপরতার প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। ইসলামী প্রতীকসমূহের সংরক্ষণের সাথে সাথে লোকদের মধ্যে নিজেদের পোশাক আশাক ও বেশভূষাও সুন্নাত মাফিক বানানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিপুল সংখ্যক তরুণ–যুবকের মুখমণ্ডলেও সুন্দর দাড়ি রয়েছে। কোন বড় সমাবেশে গেলে সেখানে শশ্রুমণ্ডিত মুসলমানদের হার হয়তো পাকিস্তান থেকে বেশিই চোখে পড়বে।

সন্তানদের শিক্ষাদানের বিষয়টি এ ধরনের অমুসলিম দেশসমূহে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে থাকে। কিন্তু মাশাআল্লাহ এখানকার আলেমগণ এই সমস্যারও চমৎকার সমাধান করেছেন। প্রত্যেক মুসলমান বসতিতে একটি প্রাথমিক ধর্মীয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে যোহর থেকে আছর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। বাচ্চারা সরকারী স্কুল থেকে অবসর হওয়ার পর এখানে আসে এবং আছর পর্যন্ত লেখাপড়া করে। এসব মাদ্রাসায় কুরআন শরীফ নাজেরা ও হিফজ, তালিমুল ইসলাম, উর্দূ এবং প্রাথমিক দ্বীনিয়াত পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। সাত বছরের

পাঠ্যক্রমে পবিত্র কুরআন এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা হয়। সকল মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা ট্রান্সুয়াল প্রদেশে জমিয়তে উলামায়ে ট্রান্সুয়াল করে থাকে এবং তাদের তত্ত্বাবধানেই পরীক্ষা প্রভৃতি কাজ হয়ে থাকে। জমিয়তে উলামায়ে ট্রান্সুয়ালের প্রধান ব্যবস্থাপক মাওলানা ইবরাহীম মিঞা সাহেব। তিনি প্রিটোরিয়া থেকে কিছু দূরে ওয়াটার ফালে একটি ফার্মে এর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাওলানা ইবরাহীম মিঞা সাহেব মিঞা বংশের ঐ পরিবারের লোক, যে পরিবার ইমামুল আসর হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আনোয়ার শাহ সাহেব কাশ্মীরী (রহঃ) এবং তাঁর সাগরেদদের তত্ত্বাবধানে দ্বীন ও ইলমের মূল্যবান খেদমত করেছেন। বর্তমানে তিনি ওয়াটার ফালের ইসলামিক সেন্টারের মাধ্যমে ট্রান্সুয়ালে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে লিপ্ত। তার পবিত্র পরিশ্রমের ফল ও প্রভাব শুধু ঐ প্রদেশেই নয় বরং সারাদেশেই অনুভব করা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার যে শহরেই আমি গিয়েছি সেখানেই মাদ্রাসা দেখতে পেয়েছি। সেসব মাদ্রাসার উস্তাদ এবং মসজিদের সকল ইমাম ও খতীবগণ দারুল উলূম দেওবন্দ, ডাভিল বা এতদুভয়ের ফয়েয প্রাপ্ত অন্যান্য মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা সমাপনকারী। সব জায়গায়ই অনুভূত হয় যে, দেওবন্দের কল্যাণের উৎস বিশ্বের কত দূর–দূরান্তের জনপদ পর্যন্ত ফয়েয বিস্তার করেছে। পৃথিবীর দক্ষিণের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত এই দেশে যেখানে কুফুরী ও ফাসেকী চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যাপকতা লাভ করেছে। সেখানে দ্বীনের কালেমা সেসব অনাড়ম্বর ও মাদুরে উপবেশনকারীদের নীরব প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবন্ত ও সমুন্নত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উক্ত ফয়েয সহকারে শান্তিতে ও নিরাপদে রাখুন এবং মুসলমানদেরকে তাঁদের নিকট থেকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি ধর্মীয় মাদ্রাসায় যাই। একটি মাদ্রাসা ওয়াটার ফালে। মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা ইবরাহীম মিঞা সাহেব। এখানে কুরআন শরীফ হিফজ, নাজেরা ও প্রাথমিক উর্দূ দ্বীনীয়াত ছাড়াও আরবী ভাষা এবং দরসে নিযামীর মাধ্যমিক কিতাবসমূহ পড়ানো হয়। ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস রয়েছে। 'দারুল ইফতা' রয়েছে। এর প্রধান

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইবরাহীম সাঞ্জালোভী সাহেব। এই মাদ্রাসা থেকে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন উপকারী পুস্তিকার প্রচার প্রসারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলমানদের ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তিকা ও গ্রন্থরাজির বিরাট ভাণ্ডার এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই মাদ্রাসায় প্রায় পুরোদিন কাটানোর সুযোগ পাই। ছাত্র ও উস্তাদদের সাথে ইলমী এবং দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে।

দ্বিতীয় মাদ্রাসাটি নাটাল প্রদেশের নিউ ক্যাসাল নামক স্থানে অবস্থিত। মাদ্রাসাটির নাম 'দারুল উলূম'। এর ব্যবস্থাপক মাওলানা ইসহাক সিমা সাহেব। এখানেও মেশকাত এর মান পর্যন্ত দরসে নিযামীর পাঠ্যক্রম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। মাদ্রাসাটি শহরের একপ্রান্তে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। একটি গির্জার ভবন ক্রয় করে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানেও একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সব প্রদেশের ছাত্র এখানে অবস্থান করে শিক্ষা অর্জন করে। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক সিমা সাহেব ডাভিল থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। মাদ্রাসার অন্যান্য উস্তাদগণ পাকিস্তানের মাদ্রাসাসমূহ থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তাদের মধ্য থেকে একজন উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুছ সাহেব আমাদের দারুল উলূম করাচীর ফারেগ। কয়েক বছর পূর্বে তিনি সেখান থেকে ফারেগ হয়ে এখানে এসেছেন।

নাটাল প্রদেশে নিউ ক্যাসাল ছাড়া ডারবান, টুংগার্ট ও পিটার মেরটাসবার্গেও যাই। ডারবান এই প্রদেশের সবচেয়ে বড় শহর। এটি ভারত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। দক্ষিণ আফ্রিকার যত শহর আমি দেখেছি, তার মধ্যে এই শহরটিই প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক দৃশ্য এবং স্থিতিশীল আবহাওয়ার দিক থেকে সর্বাধিক সুন্দর শহর। এখানেও 'জমিয়তে উলামায়ে নাটাল' নামে আলেমদের একটি সংগঠন রয়েছে। সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা ইউনুস পিটাল দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তরুণ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রাণবন্ত, কর্মতৎপর ও গম্ভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জমিয়ত হযরত মাওলানা বুখারী এবং হযরত মাওলানা আবদুল হক ওমরজীর মত অভিজ্ঞ আলেমের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। মাওলানা আহমাদ ওমর

সাহেব, যার নিকট আমরা অবস্থান করি, তিনিও জমিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আমাদের মেজবানীর হক আদায় করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের জন্য একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী সাহেব (রহঃ)এর সাহেবজাদা ডঃ সালমান নদভী এবং প্রসিদ্ধ কলামিষ্ট প্রফেসর হাবীবুল হক নদভী সাহেব এখানকার ইসলামিয়াত এবং ইসলামী ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। তারা উভয়েই ডারবান অবস্থানকালে তাদের নিখাদ সাহচর্য দ্বারা আমাকে ভূষিত করেন। ডঃ সালমান নদভী সাহেবের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখা এবং বিশেষ করে কুতুবখানা ঘুরে দেখি।

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য

দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাধিক দৃষ্টিদানযোগ্য সেখানকার স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের সমস্যা। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এখানকার কৃষ্ণাঙ্গরা রাজনৈতিকভাবে পৃথিবীর সর্বাধিক নিপীড়িত সম্প্রদায়। দক্ষিণ আফ্রিকার মূল অধিবাসী এবং ৮০ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এরা রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ভোট দেওয়া এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করা তো বিরাট ব্যাপার। তারা এর কল্পনাও করতে পারে না। তাদের জন্য শহরে বসবাস করাও নিষিদ্ধ। সারাদিন যে শহরে তারা পরিশ্রম করে, সেখানে নিজেদের জন্য বাড়ি বানাতে পারে না শুধু তাই নয়, বরং সেখানে তাদের রাত্রি যাপনেরও অনুমতি নেই। তাদের বসবাসের জন্য শহর থেকে অনেক দূরে পৃথক বসতি রয়েছে। সেই বসতির অবস্থা এই যে, যেখানে জোহান্সবার্গ, পেরিটোরিয়া ও অন্যান্য শহর বাহ্যিক জাঁকজমকের দিক থেকে লণ্ডন ও নিউইয়র্ককে ম্লান করে দেয়, সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের অনেক বসতি বিদ্যুতের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। যেসব লোক বড় শহরগুলোতে কাজ করে, তারা ভোরের আলো ফুটতেই নিজ গ্রাম থেকে রওয়ানা করে এবং রাত হলে ফিরে আসে।

কারো শহরে বাড়ি ক্রয় করার বা ভাড়া নেওয়ার সামর্থ্য থাকলেও আইনের পরিপন্থী হওয়ার কারণে তারা শহরে বাস করতে পারে না। সারা দেশে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের শিক্ষার জন্য ফিস নির্ধারিত রয়েছে। একই মানের কাজ শ্বেতাঙ্গরা করলে বেতন বেশি আর কৃষ্ণাঙ্গরা করলে বেতন অর্ধেক। নাজানি এমন কত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থান রয়েছে যেখানে শ্বেতাঙ্গদের কুকুরতো যেতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য সবসময় নিজেদের পারমিট সঙ্গে রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পুলিশ যে কোন সময় যে কোন নিগ্রোকে ধরে তার পারমিট চাইতে পারে। সে সময় কারো নিকট পারমিট না থাকলে অধিক তল্লাশি না করেই তাকে হাজতে ভরে দেয়। তাই বলা হয়, সমগ্র বিশ্বে কয়েদীর সংখ্যা এখানেই সর্বাধিক।[১]

এমন মানবতা বিধ্বংসী অত্যাচার এমন এক দেশে হচ্ছে যাকে 'সভ্য' ও 'উন্নত' দেশ বলা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার সেই সকল সভ্য দেশ, যারা সকাল সন্ধ্যা 'জনসাধারণের শাসন' এবং 'স্বাধীনতা' ও 'স্বাধিকারের' ঢোল পিটাতে থাকে, যারা সমগ্র বিশ্বে নিজেদেরকে 'গণতন্ত্রের' ধারক–বাহক বলে বিশ্বাস করিয়েছে, তারা অত্যাচার ও নিপীড়নের এই দৃশ্য খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাদের অন্তরে এ ব্যাপারে 'ন্যায়প্রিয়তার' কোন ঢেউ উঠে না। আফ্রিকা ও এশিয়ার দরিদ্র দেশসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান সরকারকে বয়কট করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রয়েছে। স্বর্ণের খনি সত্য ও ন্যায়ের সকল আওয়াজ শোনা থেকে তাদের কানকে বধির করে রেখেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানদের আসল কাজ নির্যাতিত, নিপীড়িত ও ধিকৃত এই জাতির নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছানো। তাদের সিংহভাগ খৃষ্টান। তাদের স্বধর্মী শাসকগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে যে আচরণ করছে, এতদসত্ত্বেও খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের গ্রামসমূহে তৎপরতার সাথে কাজ

টীকা–১. আলহামদুলিল্লাহ! এখন কিছু কিছু বিষয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হচ্ছে। শ্বেতাঙ্গদের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হচ্ছে। —অনুবাদক।

চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান মুবাল্লিগগণ যদি তাদেরকে দ্বীনে হক তথা সত্য ধর্ম শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ভালবাসা, হৃদ্যতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার দান করে, তাহলে এই জাতি, যারা অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অত্যাচার ও নিপীড়ন ছাড়া আর কিছুই পায়নি, খুব তাড়াতাড়ি ইসলামের দিকে আসতে পারবে। কিন্তু আফসোস এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানগণ তাদের ঈর্ষণীয় ইসলামপ্রীতি সত্ত্বেও এ দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করেনি। দুঃখজনক অবস্থা এই যে, তাদের আচরণ ওদের সাথে সাধারণত শাসক জাতির আচরণ থেকে খুব বেশি ভিন্নরকম নয়। তবে ব্যতিক্রমও আছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানদের সম্পর্কে এমন প্রতিক্রিয়াই গ্রহণ করে থাকে, যা তারা শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপারে করে।

এই পরিস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্বের প্রতি উদাসীনতা তো বটেই, তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্যও তা নেহায়েত আশংকাজনক। তার কারণ এই যে, শ্বেতাঙ্গ জাতির পক্ষ থেকে দেশের প্রকৃত অধিবাসীদের উপর জুলুম অত্যাচারের এই হুকুমাত বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। একদিন সেখানে সাম্রাজ্যবাদের সূর্য তেমনি অস্তমিত হয়ে যাবে, যেমন জিম্বাবুই ও মুজাম্বিক সহ অন্যান্য আফ্রিকান দেশসমূহে হয়েছে। স্বয়ং দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারও দেওয়ালের লিখন পাঠ করে নিজেদের আইন ক্রমান্বয়ে শিথিল করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই একদিন না একদিন এই নির্যাতিত ও নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা সাম্রাজ্যবাদের প্রাসাদ ধ্বংস করে দিয়ে এ দেশের শাসনের লাগাম সামলাবে। যদি এখানকার মুসলমানগণ তাদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ ব্যাপক না করে এবং তাদের সঙ্গে ইসলামী সাম্য ও ইনসাফের দাবী অনুপাতে আচরণ না করে, তাহলে উত্তেজিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তাদের সাথে কেমন আচরণ করবে তা কিছুই বলা যায় না।

শ্রদ্ধেয় ভাই হযরত মাওলানা রফী সাহেব উসমানী এবং এই অধম দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমান জনসাধারণ এবং বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের খেদমতে সব জায়গায় নিবেদন করেছি যে, তারা যেন এ দিকটির প্রতি

যথাযোগ্য মনোযোগ আরোপ করে। আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন এ অনুভূতি মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রচেষ্টাও চলছে। কিন্তু কাজটি এত বড়, সময় সাপেক্ষ ও ধৈর্যসংকুল যে, এই বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেওয়া কিছু সংখ্যক লোক বা সংস্থার সামর্থ্যভুক্ত নয়। তাই আমরা মনে করি যে, মুসলিম দেশসমূহের সরকারদের এদিকে মনোযোগ আরোপ করা দরকার। যদি মুসলিম দেশসমূহ বিশেষ করে সৌদি আরব ও পাকিস্তান এ ব্যাপারে নিজেদের কর্তব্য অনুভব করে ঐসব অঞ্চলে তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের উপকরণাদি ব্যয় করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ অনেক বড় লাভের আশা করা যায়। হায়! যদি মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে এমন সব দেশের অবস্থার দিকেও মনোযোগ দিতে পারত, যেখানে মানবতা ইসলামের সাম্য ও ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য ছটফট করছে।

কৃতজ্ঞতা

পরিশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার সেসব বন্ধু ও বুযুর্গের কথা উল্লেখ না করলে বড়ই অকৃতজ্ঞতা হবে, যারা এই সফরকালে একনিষ্ঠতা, ভালবাসা ও মেহমানদারীর অবিস্মরণীয় চিত্র আমার মন ও মগজে অঙ্কিত করেছেন। সেখানকার প্রত্যেক মুসলমানকেই তো এখলাস ও মুহাব্বতে মূর্ত দেখতে পেয়েছি, কিন্তু বিশেষভাবে যাদের আলোচনা করতে মন চাচ্ছে, তাদের মধ্যে জনাব আহমাদ হাসান লহর সাহেব এবং তাঁর পুত্র আবদুল হক সাহেব তো আমাদের প্রত্যক্ষ মেজবান ছিলেন। তাদের গৃহ আমাদের অবস্থানকালে সবসময় সরগরম ছিল এবং তারা মেজবানীর হকও আদায় করেছেন। সাথে সাথে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মুহাম্মাদ ইসমাইল খরা সাহেবের নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদ্যতা সর্বপ্রকার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ঊর্ধ্বে যে, তিনি এয়ারপোর্টে প্রথম সাক্ষাত থেকে নিয়ে বিদায়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিরামহীনভাবে তার উপভোগ্য সাহচর্যের দ্বারা আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন। তিনি আমাদের আরামের ব্যবস্থা করতে কোনরূপ ত্রুটি করেননি এবং এই কাজের জন্য পুরো এক মাস চাকুরী এবং

পারিবারিক ব্যস্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেন। ওরাছিয়া পরিবার বিশেষ করে সুলায়মান ওরাছিয়া, আমীন ওরাছিয়া ও আবু বকর ওরাছিয়া সাহেব তো সর্বদাই আমাদের সঙ্গে সহোদর ভাইয়ের মত সম্পর্ক রেখেছেন। এ সময় তারা এই ভ্রাতৃত্বের হক বিশেষভাবে আদায় করেন। এতদ্ব্যতীত করুগার্স ডোরাপ এবং আজাদ বেলের মুহাম্মাদ হাশেম লুনাত সাহেব, ইবরাহীম দাস্‌সু সাহেব, আহমাদ পেটেল সাহেব, মডেলবার্গের হাফেজ মুহাম্মাদ সাঈদ সাহেব, রশীদ ভামজী ও রশীদ চৌহিয়া সাহেব এবং ডারবানের মাওলানা আহমাদ ওমর সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের ভালবাসা ও একনিষ্ঠতা প্রকাশ করার মত ভাষা আমার নেই। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে জাহেরী ও বাতেনী প্রভূত উন্নতি দান করুন ও উভয় জাহানের নিরাপত্তা দানে ভূষিত করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এক রাত্রি নাইরোবীতে কাটে এবং সেখান থেকে খুরতুমের পথ ধরে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় হাজির হওয়ার তাওফীক হয়। পবিত্র মক্কায় চারদিন এবং পবিত্র মদীনায় পাঁচদিন অবস্থান করার সৌভাগ্য লাভ হয়। এবং পুনরায় একবার এ হাকীকত ভাস্বর হয়ে উঠে—

اگر جنت بریں روئے زمیں است

همیں است وهمیں است و همیں است

'এই ভূমণ্ডলে জান্নাত থেকে থাকলে তা এটিই, এটিই, এটিই'।

দ্বিতীয় সফর

রমাযানুল মুবারকের শুরুর কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ শহর থেকে আমার বন্ধু আবু বকর ওরাছিয়ার টেলিগ্রাম পাই। তাতে বলা হয়েছিল যে, কাদিয়ানীরা কেপটাউনের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে মুসলমানদের বিপক্ষে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা অর্জন করেছে। সেই

মোকাদ্দমায় মুসলমানদের পক্ষে জবাবী তৎপরতায় সাহায্য দানের জন্য আপনার তাৎক্ষণিক উপস্থিতি জরুরী। তাতে একথাও বলা হয়েছিল যে, নিষেধাজ্ঞা দৃঢ়করণের জন্য আগষ্টের ৬ তারিখকে নির্ধারণ করা হয়েছে। পাকিস্তান থেকে ফোন বা টেলেক্সের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় যোগাযোগ করা সম্ভব নয় বিধায় তারের মাধ্যমে তার জবাব দেই। তাতে বিষয়টির গুরুত্ব সামনে রেখে সেখানে যাওয়ার ওয়াদা করি। কিছুদিন পর আরেকটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানতে পারি যে, নিষেধাজ্ঞা দৃঢ়করণের তারিখ পিছিয়ে গেছে এবং সাথে একথাও জানায় যে, কেপটাউন ও জোহান্সবার্গের বন্ধুগণ ফোনের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করার বার বার চেষ্টা করেছে কিন্তু আমাকে পায়নি। দ্বিতীয়বারের টেলিগ্রামের উত্তরে আমি অধম আমার পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্রের বিস্তারিত তথ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেই, সেখান থেকে ভিসা লাভের চেষ্টা চালানোর জন্য।

নিষেধাজ্ঞা দৃঢ়করণের জন্য নতুন করে সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরে জানতে পারি যে, কেপটাউনের কিছু মুসলমান পাকিস্তান সরকার, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ও আরো কয়েকজন ব্যক্তির নিকট মোকাদ্দমার কাজে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন করেছে। বিষয়টির গুরুত্ব সকল মুসলমানের নিকটই স্বীকৃত ছিল বিধায় যাকেই এ ব্যাপারে সাহায্য করতে বলা হয়েছে, সেই অবিলম্বে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক না থাকার কারণে একমাত্র সেখান থেকেই ভিসা আসা সম্ভব ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখ পর্যন্ত কোন একজনেরও ভিসা এসে পৌছেনি। মোকদ্দমার তারিখ নিকটবর্তী হওয়ায় পাকিস্তানে অধিক অপেক্ষা করা আর সম্ভব ছিল না। এ জন্য সিদ্ধান্ত হয় যে, এখান থেকে নাইরোবী যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে ফোনে যোগাযোগ করে ভিসা লাভ করার চেষ্টা করা হবে। সুতরাং আট সদস্যের এই কাফেলা সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে আমি ব্যক্তিগত দাওয়াতের ভিত্তিতে যাচ্ছিলাম। আর মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়্যতের পক্ষ থেকে মাওলানা আবদুর রহীম

আশ'আর, মাওলানা মুফতী জয়নাল আবেদীন, এডভোকেট হাজী গিয়াস গিলামীও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তৃতীয়ত, রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর পক্ষ থেকে মাওলানা জাফর আহমাদ আনছারী এবং জাষ্টিস (অবসর) মুহাম্মাদ আফজাল চিমা সাহেবকে মনোনীত করা হয়। মাওলানা জাফর আহমাদ আনছারী সফরে তার সহযোগিতার জন্য জনাব আবদুল মজীদ সাহেবকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যা ৭টায় ৯ সদস্যের এই কাফেলা পি.আই.এ. এর বিমানযোগে নাইরোবী যাত্রা করে। পথিমধ্যে দুবাইয়ে বিরতি দিয়ে স্থানীয় সময় রাত্রি ১টায় নাইরোবী পৌঁছি। সেখানে কেনিয়ার পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত ব্রিগেডিয়ার আশরাফ সাহেব তার সচীব সহকারে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। রাত্রে হোটেল হেলটনে অবস্থান করা হয়। পরদিন সারাদিন দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে ভিসা লাভের চেষ্টায় ব্যয় হয়। পরিশেষে বিকাল ৪টায় জোহান্সবার্গ থেকে আবু বকর ওরাছিয়া সাহেব ফোনে জানিয়ে দেন যে, ভিসার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সকলেই জোহান্সবার্গ বিমানবন্দরে ভিসা পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ। সুতরাং ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ৯টায় কে.এল.এম. এর বিমানযোগে আমরা নাইরোবী থেকে যাত্রা করি। প্রায় ৪ ঘন্টা আকাশে উড্ডয়নের পর স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে বারটায় জোহান্সবার্গ জান স্মার্ট বিমান বন্দরে অবতরণ করি। এখানে আফ্রিকান বন্ধুদের বড় একটি জামাআত অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। সেদিন জোহান্সবার্গেই অবস্থান করে মোকদ্দমার বিষয় বিস্তারিত জেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ওয়াটার ফাল মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা ইবরাহীম মিঞা সাহেবের মাদ্রাসায় সকলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি অত্যন্ত দ্রুত মোকাদ্দমার কাগজের কপিসমূহ আমাদেরকে জোগাড় করে দেন। আসর নামাযের পর কয়েকজন স্থানীয় উকিলকে একত্র করেন যেন তারা সে দেশের আদালতের কর্মপন্থা সম্পর্কে জরুরী বিষয়সমূহ আমাদেরকে জানাতে পারেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার আদালতী কর্মপন্থা আমাদের দেশের কর্মপন্থা থেকে কিছুটা ভিন্ন রকম। এখানে বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে মূল কেস দায়ের করার

পূর্বে সংক্ষিপ্ত আবেদনরূপে আদালতের সামনে অভিযোগ তুলে ধরে সাময়িক নির্দেশ অর্জন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তাকে একটি শপথনামা দাখিল করতে হয়। তার মধ্যে বাদী সংক্ষেপে তার অভিযোগ তুলে ধরে ইচ্ছা প্রকাশ করতে বাধ্য হয় যে, আমি এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিবাদীর বিরুদ্ধে কেস দায়ের করব। কিন্তু মোকদ্দমার কার্যধারায় সময় ক্ষেপণের সম্ভাবনা আছে বিধায় আমার এত দিনের জন্য সাময়িক নির্দেশ প্রয়োজন। আদালত যদি বাহ্যদৃষ্টিতে মোকদ্দমার ভিত্তি আছে বলে মনে করে তাহলে অপর পক্ষের অবস্থান শ্রবণ না করে এক তরফাভাবেও সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। তবে পরবর্তীতে প্রতিপক্ষকে তার অবস্থান তুলে ধরার জন্য শপথনামা দাখিল করতে বলা হয়। তারপর নির্দিষ্ট একটি তারিখে উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণ শ্রবণ করে সেই এক তরফা নিষেধাজ্ঞা বিলুপ্ত করা হবে, নাকি তা দৃঢ় করা হবে এর ফয়সালা করা হয়। নিষেধাজ্ঞা দৃঢ় করা বা না করার ফয়সালা হওয়ার পর বাদীর নির্ধারিত একটি মেয়াদের ভিতরে আসল কেস দায়ের করার অধিকার থাকে। এখানকার পরিভাষায় একে মেইন একশন (Main action) বলে। এই একশনের সময়ে উভয় পক্ষের সাক্ষী পেশ করার পর এবং মোকদ্দমার বিস্তারিত কার্যধারা পূর্ণ করার পর মোকদ্দমার ফয়সালা হয়। তাতে কোন কোন সময় অনেক বছর সময় লেগে যায়।

মোকদ্দমার বিবরণ

কেপটাউনের মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার আর কাদিয়ানীদের সংখ্যা ২'শ থেকেও কম। এখানে তারা 'আহমাদিয়া আঞ্জুমানে এশায়াতে ইসলাম' নামে 'আহমাদিয়া আঞ্জুমান, লাহোর'এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সংগঠনটি কেপটাউনের পাঁচজন ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে শাবানের শেষ দিকে কেপটাউনের সুপ্রীম কোর্টে এই আবেদন দায়ের করে যে, তারা আমাদের লোকদের অমুসলিম সাব্যস্ত করে থাকে। ফলে তারা আমাদেরকে মসজিদসমূহে এবাদত করার এবং আমাদের মৃতদের লাশ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি দেয় না। আমরা এ ব্যাপারে বিবাদীদের বিরুদ্ধে স্ববিস্তারে মোকাদ্দমা

দায়ের করব। তার ফয়সালা হতে অনেক দেরী হতে পারে বিধায় বিবাদীদের বিরুদ্ধে মূল মোকদ্দমার ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। তখনকার জজ নিয়ম মাফিক তাদেরকে এক তরফা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দেয়। নিষেধাজ্ঞা দৃঢ়করণের জন্য প্রথমে ৬ই আগষ্ট তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল। পরে তা পিছিয়ে সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ করা হয়। এ সময়কালে পাঁচজন বিবাদীর পক্ষ থেকে বিস্তারিত শপথনামা প্রস্তুত করা হয় এবং এতদ্বিষয়ে দক্ষ হিসাবে ওয়াটারফালের হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইবরাহীম সাঞ্জালভী এবং ডারবানের ডঃ হাবিবুল হক নদভীও শপথনামা দাখিল করেন।

এই শপথনামাসমূহে মির্যায়ীদের (কাদিয়ানী) ইতিহাস, মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর স্বরূপ, তার ধাপে ধাপে দাবীসমূহ এবং খতমে নবুওয়ত আকীদা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। সাথে সাথে মির্যায়ীরা, কাদিয়ানী গ্রুপ হোক বা লাহোরী গ্রুপ, কিভাবে খতমে নবুওয়তের আকীদার খোলাখুলি বিরোধিতা করে নিজেদেরকে ইসলাম ধর্ম থেকে পৃথক করে ফেলেছে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এককণ্ঠে তাদেরকে কাফের এবং ইসলামের বহির্ভূত বলে সাব্যস্ত করেছে তাও স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা অবস্থায় মির্যায়ীদের সম্পর্কে যে সব বুনিয়াদী তথ্য জমা করা সম্ভব ছিল, তা শপথনামাসমূহে অনেকাংশে তুলে ধরা হয়েছিল। ১৯৭৪ এর খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের সময় মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী সাহেব (রহঃ)এর নির্দেশে এই অধম এবং মাওলানা সামিউল হক সাহেব যে বয়ান সংকলন করেছিলাম এবং 'মিল্লাতে ইসলামিয়া কা মাওকাফ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, আমার বড় ভাই জনাব মুহাম্মাদ ওলী রাযী সাহেব তার ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এটি দারুল উলূম করাচীর প্রকাশনা বিভাগ থেকে Qudianism on trail নামে প্রকাশিত হয়। দু' বছর পূর্বে আফ্রিকা ভ্রমণ কালে গ্রন্থটি আমি আমার কোন কোন বন্ধুকে দিয়ে এসেছিলাম। শপথনামাসমূহ প্রস্তুত করতে ঐ গ্রন্থ দ্বারাও অনেক সাহায্য মেলে।

তবে মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ এবং এখানকার আদালতের কর্মপন্থার প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি স্পষ্ট ছিল যে, উপস্থিত সময়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তিন মাস পূর্বে আদালতের জারিকৃত নিষেধাজ্ঞার অসারতা প্রমাণ করা, যার ভিত্তিতে মুসলমানদের উপর মোকাদ্দমা চলাকালীন সময়ে মির্যায়ীদেরকে (কাদিয়ানীদেরকে) মসজিদে নামায পড়তে দেওয়ার এবং কবরস্থানে দাফন করতে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে যেই আইনী ধারা তুলে ধরা জরুরী ছিল তার উল্লেখ শপথনামাসমূহে ছিল না।

সুতরাং পারস্পরিক পরামর্শক্রমে যেসব ধারা স্মরণ আসে—প্রতিনিধি দলের সম্মানিত সদস্য জনাব হাজী গিয়াস মুহাম্মাদ সাহেব, সাবেক এটর্নি জেনারেল পাকিস্তান, সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করে টাইপ করান।

সকাল আটটায় আমরা জোহান্সবার্গ থেকে বিমানযোগে কেপটাউনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। দশটার সময় কেপটাউনে পৌঁছি। বিমান বন্দরে কেপটাউনের উলামা, মাশায়েখ, বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ ও বিরাট সংখ্যক সাধারণ মুসলমান অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।

সেখানে পৌঁছে মুসলমানদের পক্ষের উকিল মিষ্টার ইসমাইল মোহাম্মাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়। জোহান্সবার্গ থেকে এখান পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তার আইনী যোগ্যতা, ওকালাতীর দক্ষতা এবং মেধা ও প্রতিভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সাক্ষাতের সময় আমরা বাস্তবেও তাকে তেমনি পাই। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই যে, মোকদ্দমার সঙ্গে তার আন্তরিকতা শুধু পেশা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তিনি ব্যক্তিগত উদ্দীপনা ও হৃদয়ের আকুতির কারণে মোকদ্দমা পরিচালনা করছেন।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে যেসব আইনী ধারা সাজানো হয়েছিল, জাষ্টিস মুহাম্মাদ আফজাল চীমা সাহেব এবং হাজী গিয়াস মুহাম্মাদ সাহেব ইসমাইল মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। প্রত্যেকটি ধারা তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এবং

কৃতজ্ঞতার সাথে শ্রবণ করেন এবং তার আলোচনায় সেগুলোকে শুধু কাজেই লাগাননি বরং তার শক্তিশালী বাগ্মিতা ও প্রভাবশালী উপস্থাপনায় সেগুলোকে অনেক আকর্ষণীয় করে তোলেন।

আদালত ও এজলাসের চিত্র

৯ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মোকদ্দমার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। কিন্তু ৯টা বাজতেই আদালত কক্ষ সম্পূর্ণরূপে ভরে যায়। এমনকি শ্রোতার আধিক্যের কারণে বড় একটি কক্ষে আদালত স্থানান্তর করা হয়। সেখানে জায়গাও প্রশস্ত ছিল এবং উপরে শ্রোতাদের জন্য একটি বিস্তীর্ণ গ্যালারীও ছিল। কিন্তু মোকদ্দমা শুরু হতে না হতেই আদালত কক্ষ ও গ্যালারী উভয়টি পরিপূর্ণরূপে ভরে যায়। কোথাও দাঁড়ানোর মত জায়গাও ছিল না। মোকদ্দমার সাথে মুসলমানদের এমন আন্তরিকতা ছিল যে, সকাল দশটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত দুইদিন মোকাদ্দমার কার্যক্রম চলতে থাকে। অনেক মানুষ বসার জায়গা না থাকায় পুরা সময় দাঁড়িয়ে থেকে মোকাদ্দমার কার্যক্রম শুনতে থাকেন। এমনকি মুসলমান মহিলারাও সন্তানদেরকে কোলে নিয়ে চূড়ান্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে গ্যালারীতে বসে থাকে।

জজ ছিলেন একজন খৃষ্টান মহিলা। মির্যায়ীদের (কাদিয়ানীদের) পক্ষ থেকে দুইজন ইহুদী উকিল মোকদ্দমা পরিচালনা করছিলেন এবং একজন তরুণ মির্যায়ী উকিল তাদের সাহায্য করছিলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রধান উকিল ছিলেন ইসমাইল মুহাম্মাদ সাহেব। প্রথম দিন মির্যায়ীদের ইহুদী উকিল মিঃ ইয়াং এর উপর নিষেধাজ্ঞা দৃঢ়করণের জন্য দলীল প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তিনি দলীল পেশ করার পূর্বে দাঁড়িয়ে এই আবেদন করেন যে, মোকদ্দমায় 'আঞ্জুমানে এশায়াতে ইসলাম লাহোর' এর পক্ষ থেকে দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে। এখন মিঃ পেক নামক এক ব্যক্তিকে এই দরখাস্তের শরীক হিসেবে মোকদ্দমার পক্ষ বানানো হোক।

এই আবেদনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত তাদের মোকদ্দমার একটি আইনী

দুর্বলতাকে দূর করা। আসল কথা এই যে, মূল আবেদন যেহেতু একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছিল, যা শুধুমাত্র একজন Legal person (অস্তিত্বহীন কাল্পনিক আইনী ব্যক্তি) এর মর্যাদা রাখে এবং প্রকৃতপক্ষে সে কোন মানুষ নয়, এজন্য একটি সংগঠন হিসেবে সে মানহানীর দাবীদার হতে পারছিল না। এমনিভাবে কবরস্থানে সমাহিত হওয়ার এবং মসজিদে প্রবেশ করার দাবী করতেও সক্ষম ছিল না। সুতরাং মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই আবেদনের বিপক্ষে এই আইনী ধারাটিও তুলে ধরার কথা ছিল।

সম্ভাব্য এই আইনী আপত্তি দূর করার জন্য মির্যায়ীদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত দরখাস্ত পেশ করা হয়। যাতে মিঃ পেক একজন মানুষ হিসেবে উক্ত আবেদনের হকদার সাব্যস্ত হতে পারে এবং সংগঠনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলেও কমপক্ষে মিঃ পেকের দরখাস্ত ঠিক থাকে।

জজ সাহেব এ সময় মুসলমান পক্ষের উকিলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই দরখাস্তের ব্যাপারে আপনার অবস্থান কি? মুসলমান পক্ষের উকিল বলেন যে, মোকাদ্দমার এই পর্যায়ে এসে দরখাস্ত করা আমাদের নিকট তীব্র আপত্তিজনক। কেননা এখন পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জুমানের দরখাস্তের ভিত্তিতেই বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং তারই উত্তরদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিধায় এই পর্যায়ে এসে কোন ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ বানানো আমাদের জন্য ইনসাফ পরিপন্থী হবে। জজ সাহেব তখন দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করে মির্যায়ী পক্ষের উকিল মিঃ ইয়াংকে প্রমাণ পেশ করতে বলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মির্যায়ী পক্ষের উকিল মিঃ ইয়াং এর আলোচনাতেই সারাদিন কেটে যায়। সে বারবার একই কথা বলছিল যে, মির্যায়ীরা যেহেতু মুসলমান এবং তারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে তাই তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার কারো অধিকার নেই। এমনিভাবে তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে বা তাদের মৃতদের লাশ কবরস্থানে দাফন করতে কেউ বাধা দিতে পারে না। জজ সাহেব তাকে একথা বলে বারবার বাধা দিচ্ছিলেন যে, এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত করা আমাদের জন্য সম্ভব নয় এবং আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তও নয় যে,

মির্যায়ীরা মুসলমান নাকি কাফের। যখন আপনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, বছর বছর ধরে মুসলমানগণ আপনাদেরকে অমুসলিম মনে করে আসছে এবং আপনাদের কোন লোক মুসলমানদের কবরস্থানে সমাহিত হয়নি। তাহলে আজ এমনকি সমস্যা দেখা দিল, যে কারণে হঠাৎ করে আপনারা নিষেধাজ্ঞা লাভের জন্য আবেদন করলেন?

মিঃ ইয়াং তার দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও এই প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত কোন উত্তর দিতে পারেননি। তবে এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, নিষেধাজ্ঞার জন্য আমাদের সাময়িক প্রয়োজন এই যে, আমাদেরকে কাফের বলা থেকে যদি কেপটাউনের আলেম ও মাশায়েখদেরকে বাধা প্রদান করা না হয়, তাহলে অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কাদিয়ানী ও অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে সকল বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

তখন জজ সাহেব বললেন, কিন্তু রেকর্ডে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ নেই, যার দ্বারা কোন কাদিয়ানীর অকাদিয়ানীর সঙ্গে বিবাহ প্রমাণিত হয়।

উত্তরে ইয়াং সাহেব বললেন, জনাব! এ বিষয় রেকর্ডে থাকা জরুরী নয়। আপনার এ বিষয়ে জুডিশিয়াল নোটিশ নেওয়া উচিত যে, মুসলমান মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ করে। আর আহমদীরা (কাদিয়ানী) যেহেতু মুসলমান, তাই তাদের আপোষে অবশ্যই বিবাহ হয়ে থাকবে। তখন জজ সাহেব নির্দ্বিধায় বললেন, আপনি চান যে, এভাবে আমি আপনাদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি আগেই ফয়সালা করে দেই। তারপর মুসলমানদের সঙ্গে আপনাদের বিবাহ হওয়ার জুডিশিয়াল নোটিশ গ্রহণ করি? এটি কি করে সম্ভব? আমার জুডিশিয়াল নোটিশ তো এই যে, মুসলমান মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ করে থাকে আর কাদিয়ানী কাদিয়ানীর সঙ্গে বিবাহ করে থাকে।

মোটকথা এরকম মনোমুগ্ধকর টোকাটুকি সারাদিন চলতে থাকে এবং বিকাল চারটার দিকে যখন আদালতের সময় শেষ হতে মাত্র ১৫ মিনিট বাকী ছিল, তখন জজ সাহেব মুসলমান পক্ষের উকিল ইসমাইল মুহাম্মাদ সাহেবকে প্রমাণ পেশ করার আমন্ত্রণ জানান। সময় সংক্ষিপ্ত ছিল বলে তিনি প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার পূর্বে অবশিষ্ট ১৫ মিনিট তার আইনী ধারা সমূহের সারাংশ ক্রমান্বয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী

ভঙ্গিতে তুলে ধরেন। সাথে সাথে তার প্রমাণাদি সবিস্তারে লিখিত আকারে জজের হাতে অর্পণ করেন এবং বলেন যে, এসব আইনী ধারার উপর বিস্তারিত আলোচনা আমি আগামীকাল করব। তখন ঐ দিনের এজলাস শেষ হয়ে যায়।

পরদিন ইসমাইল মুহাম্মাদ সাহেব তার প্রমাণাদি তুলে ধরতে শুরু করার কথা, কিন্তু তার পূর্বেই মিঃ ইয়াং দাঁড়িয়ে যান এবং তার সেই আবেদন পুনঃ দৃষ্টিদানের জন্য পেশ করেন যে, এই মোকাদ্দমাতে মিঃ পেককে পক্ষ বানানো হোক এবং এই আবেদন আঞ্জুমানে এশায়াতে ইসলাম ছাড়াও মিঃ পেকের পক্ষ থেকে ধরে নেওয়া হোক।

জজ সাহেব এই আবেদনের ব্যাপারটি মূলতবী রেখে ইসমাইল মুহাম্মাদ সাহেবকে তার প্রমাণাদি তুলে ধরতে বলেন। তখন তিনি তার বক্তব্য আরম্ভ করেন। তিনি এতদসংশ্লিষ্ট আইনের যাবতীয় ধারা অতি সুন্দররূপে সুবিন্যস্ত আকারে ও দৃঢ়তার সাথে বক্তব্যে সন্নিবেশিত করেন।

মুসলমানদের পক্ষের উকিলের বক্তব্য

এখানে ইসমাইল মুহাম্মাদ সাহেবের পূর্ণ বক্তব্য এবং তার যাবতীয় দলীল প্রমাণ ও ধারা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, তবে সেখান থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা আলোচনা করলে পাঠকের মনোরঞ্জনের কারণ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তার উপস্থাপিত প্রথম ধারাটি ছিল এই যে, বিভিন্ন আইনী দৃষ্টান্তের আলোকে আবেদনকারীর নিষেধাজ্ঞা লাভের অধিকার শুধুমাত্র সে অবস্থাতেই হতে পারে, যখন বাহ্যিকভাবে মোকদ্দমা বাদীর অনুকূলে হয় এবং এতে মারাত্মক কোন সন্দেহ সংশয় এবং জটিল আপত্তিসমূহ না থাকে। পক্ষান্তরে এখানে আবেদনকারীর মোকদ্দমাটি বাহ্যিকভাবেই ভ্রান্ত ও অনেক জটিল আপত্তিতে পরিপূর্ণ। শপথনামাসমূহ থেকে স্পষ্ট যে, সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণ মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদেরকে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত এবং কাফের সাব্যস্ত করে থাকে। এর ভিত্তিতেই পাকিস্তানে যেখানে মির্যায়ীদের হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত, কওমী এসেম্বলী (পার্লামেন্ট) ও সিনেট তাদেরকে অভিযোগ খণ্ডনের

পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে এবং প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করে সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে অমুসলিম সাব্যস্ত করেছে এবং সে অনুপাতে পাকিস্তানের সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন রাবেতায়ে আলমে ইসলামী সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একশ চল্লিশোর্ধ নেতৃত্ব দানকারী সংগঠনের সম্মিলিত সমাবেশে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অনুসারীদেরকে এক বাক্যে অমুসলিম সাব্যস্ত করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত মুসলমান তাদেরকে সর্বদা অমুসলিম সাব্যস্ত করে আসছে এবং তাদের সাথে অমুসলিমের ন্যায় আচরণ করে আসছে, যার স্বীকৃতি আবেদনকারীর শপথনামাতেই বিদ্যমান রয়েছে।

মুসলমানদের শপথনামাসমূহের মধ্যে মির্যা সাহেবের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে চয়নকৃত বিস্তারিত অংশ দ্বারা একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, সে শুধুমাত্র নবী ও রাসূল হওয়ার দাবীই করেনি বরং নিজেকে হযরত ঈসা (আঃ) থেকে সকল মর্যাদায় অগ্রগণ্য বলেছে। হযরত ঈসা (আঃ)কে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। নিজেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়ানবী, তাঁর সমকক্ষ ও পূর্ণ প্রকাশস্থল বলেছে। নাউযুবিল্লাহ! উপরন্তু শপথনামাসমূহে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী উলূমে (জ্ঞান–বিজ্ঞানে) দক্ষ ও পারদর্শীদের সুস্পষ্ট উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন অর্থেই কোন প্রকারের নবুওয়াতের দাবীদারই কখনো মুসলমান হতে পারে না।

পক্ষান্তরে মির্যায়ীদের শপথনামাতে তাদের মুসলমান হওয়ার কোন প্রমাণই তুলে ধরা হয়নি এবং ইসলামিয়াতের কোন দক্ষ বিশেষজ্ঞের বক্তব্যও তাদের স্বপক্ষে পেশ করা হয়নি। তাই স্পষ্টতই মোকদ্দমা কিছুতেই তাদের পক্ষে হতে পারে না।

এতদব্যতীত আবেদনকারী তার বিবরণীতে স্বীকার করেছে যে, তারা 'আহমাদিয়া আঞ্জুমানে লাহোর' এর একটি শাখা। বলা বাহুল্য যে, আঞ্জুমানে আহমাদিয়া, লাহোরের সদস্যদেরকে পাকিস্তানের সংবিধান অমুসলিম সাব্যস্ত করেছে বিধায় তাদের সদস্যরা মুসলমানদের কবরস্থানে সমাহিত হওয়ার অধিকার রাখে না। লাহোরের আঞ্জুমান তাদের এই

অবস্থান সম্পর্কে সেখানকার কোন আদালতে কখনো চ্যালেঞ্জ করেনি। তাই এই আঞ্জুমানেরই অধীনস্থ একটি শাখা মূল আঞ্জুমানের (সংগঠন) সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানের কি করে দাবী করতে পারে? এ দিক থেকেও সুস্পষ্ট যে, মোকাদ্দমা তাদের পক্ষে নয়, বরং বিপক্ষেই যাবে।

দ্বিতীয় ধারা এই ছিল যে, নিষেধাজ্ঞার রায় প্রদানের জন্য আদালতকে এও দেখতে হয় যে, সুবিধাজনক দিকটি (Balance of Convenience) কোন পক্ষে রয়েছে অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা জারি করলে বিবাদী বিজয়ী হলে তার বেশি ক্ষতি হবে? নাকি জারি না করলে বাদী জিতলে তার বেশি ক্ষতি হবে?

এখানকার পরিস্থিতি এই যে, কেপটাউনের মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। আর কাদিয়ানীদের সংখ্যা দেড় দুইশর অধিক নয়। এমতাবস্থায় যদি এই ২৬ হাজার মুসলমানকে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মির্যায়ীদেরকে অমুসলিম মনে করা সত্ত্বেও তাদের মসজিদে এবাদত করা এবং কবরস্থানে লাশ দাফন করার অনুমতি দানে বাধ্য করা হয়, তাহলে মূল মোকদ্দমার রায় না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের বিশ্বাসে, অন্তরের অনুভূতিতে এবং ধর্মীয় আবেগে যেই প্রচণ্ড চাপ পড়বে মোকদ্দমা জেতার পরে তার ক্ষতি পূরণের কোন রাস্তা থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি নিষেধাজ্ঞা জারি না করা হয়, তাহলে মির্যায়ীদের অপূরণীয় কোন ক্ষতি হবে না। তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, ১৪ বছর ধরে তাদের কোন মৃত মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হয়নি। তাই মোকাদ্দমার রায় হওয়া পর্যন্ত আরো দু'তিন বছর যদি এই অবস্থাতেই থাকে, তাহলে কোন অপূরণীয় ক্ষতি তাদের হবে না। বিধায় 'তুলনামূলক সুবিধা'এর মূলনীতিও স্পষ্টভাবে মুসলমানদের স্বপক্ষে এবং মির্যায়ীদের বিপক্ষে রয়েছে।

তৃতীয় ধারা সেটিই ছিল যে, আলোচনাধীন মোকদ্দমায় আবেদন কোন মানুষ করেনি বরং একটি আঞ্জুমান (সংগঠন) করেছে। সংগঠনটি মসজিদেও প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে না, কবরস্থানেও দাফন হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, বিধায় সংগঠনের এই আবেদন প্রথম দৃষ্টিতেই শোনার অযোগ্য। এ সময় ইসমাইল মুহাম্মাদ সাহেব কৌতুক করে

একথাও বলেন যে, 'যদি এই সংগঠন ভূমিতলে সমাহিত হতে পারত, তাহলে তো আমরা খুবই খুশী হতাম, কিন্তু কি করব, কবরস্থানে সমাহিত হওয়ার জন্য তো মানুষ হওয়া দরকার।'

সাথে সাথে তিনি এও বলেন যে, মির্যায়ীদের উকিল মিঃ ইয়াং তার মোকদ্দমার দুর্বলতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত রয়েছেন। গতকাল এবং আজকে তিনি মিঃ পেককে বাদী পক্ষ বানানোর জন্য যেই আবেদন করেছেন, তা তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট ও মুক্ত ভাষায় তার পরাজয়ের স্বীকৃতি। তিনি জানেন যে, আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে এই আবেদন আইনের দৃষ্টিতে কোন মূল্য রাখে না, তাই মোকদ্দমাকে একদম অন্তিম মুহূর্তে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি মিঃ পেককে বাদী পক্ষ বানাতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে যদি তাদের সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে মারাত্মক অবিচার করা হবে। আমাদের সকল বক্তব্য আঞ্জুমানের দাবীর উত্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমেই যদি মিঃ পেকের পক্ষ থেকে দাবী করা হত, তাহলে আমাদের উত্তরমূলক শপথনামায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা যেত। বিধায় ১১টা বেজে ৫৯ মিনিটে পক্ষ বানানোর এই আবেদন কোনভাবেই মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য নয়।

দুপুর বারোটা বাজতে চলছিল। জুমুআর সময় হতে যাচ্ছিল। জজ সাহেব এ সময় পক্ষ বানানোর আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বেলা দুইটা পর্যন্ত আদালত মূলতবী করে দেন।

আদালতের রায়

জুমুআর পর বেলা দুইটায় পুনরায় এজলাস শুরু হয়। তখন মির্যায়ীদের দ্বিতীয় উকিল ইসমাইল মুহাম্মাদের উত্তরে বক্তব্য শুরু করে এবং মিঃ ইয়াং এর তুলে ধরা কথাগুলোই প্রায় পুনরুক্তি করতে থাকে। অবশেষে বিকাল ৪ ঘটিকায় যখন আদালতের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন জজ সাহেব মোকদ্দমার রায়ের প্রমাণাদি শ্রবণ করাকে পিছিয়ে দিয়ে তার সংক্ষিপ্ত হুকুম শুনিয়ে দেন যে, আদালতের পক্ষ থেকে যেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। মোকদ্দমার খরচও আবেদনকারী অর্থাৎ মির্যায়ী সংগঠন

(কাদিয়ানী)কে বহন করতে হবে, তবে ব্যয়ের পরিমাণ পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে।

এই রায় ঘোষণা করার পর আদালত কক্ষের দৃশ্য উপভোগ করার মত ছিল। সকল মুসলমান পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে একে অপরকে মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। ইসমাইল মুহাম্মাদ সাহেবের অনুরোধে কেপটাউনের শেখ নাজিম সাহেব দুআ করেন। এভাবে বিষয়টি আলহামদুলিল্লাহ উত্তমভাবে ও কল্যাণের সাথে সমাপ্ত হয়।

বর্তমান পরিস্থিতি এই যে, এই রায়ের পর ২১ দিন পর্যন্ত মির্যায়ীদের মূল মোকদ্দমা দায়ের করার অধিকার রয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে তারা মোকদ্দমা দায়ের না করলে বিষয়টি সমূলে শেষ হয়ে যাবে, তবে যদি তারা এই সময়ে মূল মোকদ্দমা দায়ের করে, তাহলে বাহ্যত এটি দীর্ঘ সময় নেবে। তখন দক্ষ লোকদের সাক্ষ্য দানেরও প্রয়োজন পড়বে এবং তার রায় হতে দু' তিন বছরও লাগতে পারে। তবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ার পর মোকদ্দমা দীর্ঘ সময়ব্যাপী হলেও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর হবে না, ইনশাআল্লাহ।

মোকদ্দমা থেকে অবসর লাভের পর আরো ২৪ ঘন্টা কেপটাউনে অবস্থান করি। এ সময় এখানকার বিশেষ দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখার কাজে এবং এখানকার উলামা মাশায়েখ ও ধর্মীয় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মোলাকাতে অতিবাহিত হয়।

আশার চূঁড়া

কেপটাউন পৃথিবীর দক্ষিণে আফ্রিকার শেষ প্রান্ত। এটি দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাধিক পুরাতন শহর এবং তার সবচেয়ে বড় প্রদেশ। রাসে উম্মীদ (আশার চূড়া) (Cape of Good Hope) এর রাজধানী। এটিই সেই জায়গা, যেখান থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামা হিন্দুস্থানের পথ আবিষ্কার করেন। হিন্দুস্থানে ব্যবসা করার ও তার নেপথ্যে রাজনীতির প্রসার ঘটানোর জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহ দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি পথের সন্ধানে ছিল, যা মুসলমানদের আক্রমণ ও প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ হবে। এ উদ্দেশ্যে তারা

সামুদ্রিক অভিযান শুরু করে। এমনকি ১৪৮৭ ঈসায়ীতে যখন বর্তলমাইডাইস আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে প্রত্যাবর্তন করে, তখন পর্তুগালের বাদশাহ জানদুম আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তের এই আবিস্কারকে ভবিষ্যত অভিযানসমূহের জন্য আশাব্যঞ্জক মনে করে এর নাম দেন রসে উম্মীদ বা Cape of Good Hope (আশার চূড়া)। ১০ বছর পর রাসে উম্মীদের সেই পথে ভাস্কো দা গামা হিন্দুস্থান পৌঁছতে সফল হন। এ কারণেই এখনো পর্যন্ত প্রদেশটির নাম 'রাসে উম্মীদ' বিদ্যমান রয়েছে।

পরবর্তীকালে রাসে উম্মীদ পাশ্চাত্য দেশসমূহের বাণিজ্যিক সফরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মঞ্জিল সাব্যস্ত হয়। ফলে তারা ঐ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের দাঁত বসিয়েছিল। অবশেষে হল্যাণ্ডের ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে। তারা স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের উপর প্রাধান্য লাভ করার জন্য এখানে শ্বেতাঙ্গদের অধিবাস বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়। হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এখানে অধিবাস স্থাপনে প্রস্তুত ছিল না। তবে ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় (কেপপ্রাভেন্স প্রবন্ধে) লিখেছে যে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের সাম্রাজ্য স্থাপনের শখ পুরা করার জন্য হল্যাণ্ডের বিভিন্ন এতীমখানা থেকে এতীম কিশোরীদেরকে একত্র করে এখানে পাঠিয়ে দেয়। অপরদিকে নির্বাসনে সাজাপ্রাপ্ত লোকদেরকে জোরপূর্বক এখানে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে এখানে শ্বেতাঙ্গ লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের বংশ বিস্তার লাভ করে এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য অধিবাসী হয়ে যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের অবিস্মরণীয় কুরবানী

ডাচ সাম্রাজ্যবাদের এই সময়কালে (সপ্তদশ শতাব্দী) দক্ষিণে আফ্রিকার মাটিতে কেপটাউনের পথেই প্রথমবার ইসলামের আলো প্রবেশ করে। এখানে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রবেশের কাহিনীও অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ, যার দ্বারা অনুমিত হয় যে, মুসলমানদের পূর্বসূরীগণ পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডে ইসলাম প্রচারের ও সংরক্ষণের জন্য কিরূপ বিশাল কুরবানী দিয়েছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের ডাচ সম্প্রদায় একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অপরদিকে মালদ্বীপ ও তার আশেপাশের উপদ্বীপসমূহকেও তাদের সাম্রাজ্যের কব্জায় আবদ্ধ করে নেয়। মালদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী উপদ্বীপসমূহে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। সেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বারবার স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ডাচ সম্প্রদায় সবসময় তাদের স্বভাব মত সেসব আন্দোলনকে জোর জবরদস্তি করে দাবিয়ে দেয় এবং সেখানকার অনেক মুসলমান মুজাহিদকে গ্রেফতার করে গোলাম বানিয়ে রাখে। গোলাম বানানো সত্ত্বেও যে কোন সময় বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল বিধায় ডাচ সরকার তাদেরকে দেশান্তর করে কেপটাউনে পাঠিয়ে দেয়। যাতে করে তারা স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করে একেবারে হস্তপদহীন তথা অসহায় হয়ে যায়।

সুতরাং মালদ্বীপ ও তার আশেপাশের প্রায় তিনশ' মুসলমান মুজাহিদকে ক্রীতদাস বানিয়ে পায়ে শিকল বেঁধে কেপটাউনে আনা হয়। এখানেও তাদের ঈমানী শক্তির কারণে সর্বদা ডাচ জাতি আশঙ্কায় থাকত, সেজন্য তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার এবং তাদের বংশধরকে ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত করার পূর্ণ চেষ্টা চালানো হয়। সুতরাং সেই নিপীড়িত মুসলমানদের নামায পড়া তো দূরের কথা কালিমা পড়ারও অনুমতি ছিল না। তাদের দ্বারা সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ নেওয়া হত। কোন ব্যক্তি যদি নামায পড়ার বা যিকির করার চেষ্টা করত তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত।

ধন্যবাদ সেসব খোদাপ্রেমিক মুজাহিদদেরকে, যারা নির্বাসন ও অত্যাচারের আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের দ্বীন ও ঈমান সযত্নে সংরক্ষিত রেখেছেন। সারাদিন পরিশ্রম ও কষ্টের যাঁতায় পিষ্ট হওয়ার পর এই দৃঢ় সংকল্প মুজাহিদগণ যখন রাত্রিতে বাসস্থানে পৌছতেন, তখন ক্লান্তিতে অসাড় হওয়া সত্ত্বেও তাদের তত্ত্বাবধায়কদের ঘুমানোর অপেক্ষা করতেন। তারা নিদ্রামগ্ন হলে রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে একটি পাহাড়চূড়ায় আরোহণ করে সারাদিনের নামায একত্রে কাযা করতেন। কেপটাউনের একজন আলেম শায়েখ আবদুল মাজীদ আমাকে তার

গাড়ীতে করে সেই পাহাড়ের উপর নিয়ে যান এবং সেই জায়গা দেখান যেখানে এই দৃঢ়সংকল্প আল্লাহর বান্দাগণ রাতের অন্ধকারে সেজদাবনত হতেন। জায়গাটি প্রাচীন শহর থেকে বেশ দূরে। সারাদিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের ক্লান্তিতে চূর্ণ মুসলমানগণের প্রতিদিন এখানে এসে নামায আদায় করা এমন এক মুজাহাদা ও সাধনা, যার কল্পনাও নয়ন যুগলকে অশ্রুসিক্ত করে দেয়। আল্লাহ পাক তাঁদের উপর অসংখ্য ধারায় রহমত বর্ষণ করুন। আমীন।

বছর বছর ধরে আল্লাহর বান্দাগণ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকেন এবং এমন প্রতিকূল অবস্থাতেও তাঁরা ঈমানের প্রদীপ শুধুমাত্র নিজেদের বক্ষেই প্রজ্জ্বলিত রাখেননি বরং এই আমানত তাঁদের ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকটেও পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রায় আশি বছর মুসলমানদের উপর এভাবে অতিবাহিত হয় যে, তাদের জন্য না মসজিদ বানানোর অনুমতি ছিল, না নামায পড়ার অনুমতি ছিল। পরিশেষে বৃটিশ শ্বেতাঙ্গরা কেপটাউনে আক্রমণ করে এ অঞ্চলকে ডাচ সম্প্রদায় থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তারা বিশাল এক সেনাবাহিনী সহকারে রাসে উম্মীদের উপকূলে পৌঁছে যায়। এই যুদ্ধে ডাচ সম্প্রদায়ের জন্য এমন বাহাদুর সিপাহীর প্রয়োজন ছিল, যারা জান হাতে নিয়ে ইংরেজদের পথ বন্ধ করে দিবে। জান কুরবানী করার জন্য নির্বাসিত এই মুসলমানদের থেকে অধিক উপযুক্ত আর কেউ ছিল না। সুতরাং ডাচ সরকার নির্যাতিত ও নিঃস্ব মুসলমানদেরকে যুদ্ধের সম্মুখভাগে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সময় আল্লাহর এই বান্দাগণ নিজেদের অত্যাচারী ও জালিম মনিবদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আক্রমণাত্মক ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে নিজেদের জানের নজরানা পেশ করার সময় তারা ডাচ সরকার থেকে কোনরূপ টাকা পয়সাও চায়নি এবং নিজেদের অন্য কোন আরাম আয়েশও তালাশ করেনি। হ্যাঁ, একটি মাত্র শর্ত তারা পেশ করেছিল আর তা এই যে, এই যুদ্ধের বিনিময়ে আমাদেরকে কেপটাউনে একটি মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি দেওয়া হোক। সুতরাং এভাবে বিরাট সংখ্যক মুসলমান নিজেদের জান দিয়ে

এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করে। এটি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম মসজিদ, যা মালদ্বীপের ঐ নির্যাতিত ও নিপীড়িত অধিবাসীগণ নির্মাণ করেছিলেন।

আমার বন্ধু এ্যাডভোকেট আহমাদ চৌহান আমাকে সেই মসজিদটি দেখানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। কমবেশি তিনশ' বছর পূর্বে নির্মিত এই মসজিদটি আজও সেই আদলেই রয়েছে। মেহরাব এখনো পূর্বের মতই রয়েছে। তার দ্বারপ্রাচীর থেকে তার নির্মাণকারীদের এখলাসের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ঘটনাচক্রে কেপটাউনে নাগরিক সুবিধাদি অনেক উন্নত হলেও মসজিদটি তার সেই পূর্বের সাদামাটা অবস্থাতেই রয়েছে। এখানকার মসজিদসমূহের ইমামগণ আজও সেই খানদান থেকেই নিয়োগপ্রাপ্ত হন, যে খান্দান থেকে প্রথম নির্মাণের সময় ইমাম নিয়োগ করা হয়েছিল। শুধুমাত্র একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে আর তা এই যে, যে সহায় সম্বলহীন মুসলমানগণ প্রথমে এই মসজিদ বানিয়েছিলেন, তাদের নিকট কেবলার সঠিক দিক জানার উপযুক্ত কোন যন্ত্র ছিল না। তাই সম্ভবত তারা অনুমান করে কেবলার দিক নির্ধারণ করে মসজিদের মেহরাব বানিয়েছিলেন। পরে যন্ত্র দ্বারা জানা যায় যে, মেহরাব কেবলার সঠিক দিক থেকে অনেক দূরে রয়েছে। সুতরাং বর্তমানে নামাযের কাতার মেহরাবের দিকে না করে বাঁকা করে কেবলার সঠিক দিকে করা হয়।

মসজিদের আঙ্গিনাতেই একটি খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। কেপটাউনের আশপাশে কোথাও খেজুর বৃক্ষ চোখে পড়েনি, বিধায় এটি দেখে বিস্ময় জাগল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, এই মসজিদের এক ইমাম সাহেব হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র হেজাযে গমন করেন। ফিরতিকালে তিনি পবিত্র মদীনার খেজুর নিয়ে আসেন। তার একটি বীচি তিনি এখানে বপন করেছিলেন। তা থেকে গাছটি উৎপন্ন হয়েছে।

মালদ্বীপের এই মুসলমানগণ এভাবে অতি উচ্চ কোরবানী পেশ করে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন। বর্তমানে আল্লাহর ফজলে কেপটাউনে অনেক মসজিদ রয়েছে। হাজার হাজার মুসলমান আবাদ রয়েছে। তাদের সিংহভাগই মালয় বংশের মুসলমান। পরবর্তীতে কিছু হিন্দুস্থানী বাসিন্দাও এখানে বসতি স্থাপন করে। এই মালয় মুসলমানগণ

শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন বলে মিসর ও শামের আলেমদের সঙ্গে তাদের বেশি যোগাযোগ রয়েছে। তারা নিজ সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন লাভ করার জন্য মিসর ও সিরিয়াতে পাঠাতে থাকেন। সুতরাং এখানে সাধারণত মিসর থেকে শিক্ষা লাভকারী মাশায়েখগণ দ্বীনী খেদমত সম্পাদন করতে থাকেন এবং বর্তমানেও এখানকার আলেমদের মধ্যে শায়েখ নাজ্জার, শায়েখ নাজিম ও শায়েখ আবদুল মাজীদ প্রমুখ জামিয়া আল আযহারেই শিক্ষা সমাপন করেছেন। তবে এখন সেখানে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপনকারী আলেমগণও পৌঁছেছেন।

দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের একজন মাওলানা ইউসুফ কিরান সাহেব আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আলেম। তিনি মাশাআল্লাহ উর্দূ, আরবী, ফারসী, ইংরেজী ও স্থানীয় বান্টু ভাষা ছাড়া ফরাসী, ডাচ ও জার্মানী ভাষা সম্পর্কেও অবগত। তিনি কেপটাউনের উচ্চ প্রতিভা সম্পন্ন ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কাদিয়ানীদের এই মোকদ্দমার ব্যাপারে তিনি নীরবে অনেক খেদমত করেছেন এবং আমাদের সফরের ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী অংশগ্রহণ করেছেন।

কেপটাউন নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং আবহাওয়ার দিক থেকে বিশিষ্ট একটি শহর। এখানকার টেবল মাউন্টেন জগত বিখ্যাত একটি পাহাড়। এর শিখর চতুষ্কোণ টেবিলের ন্যায়। কেপটাউন শহর তারই পাদদেশে অবস্থিত। এখান থেকে প্রায় ৮০/৯০ কিঃ মিঃ দূরে আফ্রিকা মহাদেশের সেই প্রান্তও রয়েছে, যেখানে এই দিকে শুধু আফ্রিকারই নয় বরং পৃথিবীর শেষ বসতি অঞ্চল। এখান থেকে দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত শুধু পানি আর পানি। এটিকে কেপ পয়েন্ট বলে। এটি সেই স্থান, যেখানে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর মিলিত হয়েছে। বলা হয় যে, রোদ তীব্র হলে সাগরদ্বয়ের মাঝে একটি রেখা দৃষ্টিগোচর হয়, যা

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ -

অর্থাৎ, "তিনি উভয় সাগরকে সম্মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে একটি আড়াল, যা তারা অতিক্রম করে না।" এর দৃশ্য তুলে ধরে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় আমরা রেখাটি দেখতে

পারিনি। তবে সুদৃশ্য পাহাড় সারি এবং সবুজ শ্যামল অরণ্যরাজির উভয়দিকে বিশ্বের দুই মহাসাগরের প্রবাহ এবং ত্রিকোণ বিশিষ্ট এক উপদ্বীপের মাথায় উভয় সাগরের একাত্ম হওয়ার দৃশ্য এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য বটে—

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

"কত মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ!"

কেপটাউন থেকে ফিরে এসে আমার অধিকাংশ সঙ্গী ফিরতি যাত্রা করে, কিন্তু মুফতী মাওলানা জয়নাল আবেদীন সাহেব, মাওলানা আবদুর রহীম আশআর সাহেব এবং আমি অধম আরো পাঁচ ছয়দিন দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান করি। এ সময় জোহান্সবার্গ কারুগারডোরক এবং আজাদ বেলে যাই। এখানকার পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাত হয়। একদিনের জন্য ডারবানেও যাওয়া হয়। মাওলানা আহমাদ ওমর সাহেব ও তার পিতা সোলায়মান ওমর সাহেব সেখানে যাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেন। এখানে জমিয়তে উলামায়ে নিটালের মাওলানা আবদুল হক ওমরজী, মাওলানা ইউনুস পেটেল ও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ডঃ সালমান নদভীর সাথে সাক্ষাত হয়। ডঃ সালমান নদভী সাহেব, হযরত আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী সাহেব (রহঃ)এর বড় ছেলে। তিনি ডারবান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত বিভাগের প্রধান। এবার তার মুখমণ্ডলে নূরানী ও অতিসুন্দর দাড়ি দেখে মনে হচ্ছিল যেন হযরত আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (রহঃ) তার যৌবনে ফিরে এসেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে আফিয়াত ও সালামত তথা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে দ্বীনের অধিকতর খিদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুসলমানদের উপর কৃষ্ণাঙ্গদের আক্রমন, কারণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায়

১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমরা জোহান্সবার্গ থেকে নাইরোবী যাত্রা করি। নাইরোবী কেনিয়ার রাজধানী। এখানে বিরাট সংখ্যক পাকিস্তানী ও হিন্দুস্থানী অধিবাসী রয়েছে। আমি এখানে ইতিপূর্বে আরো দু'বার এসেছি। কিন্তু এবার এখানকার এশিয়ান অধিবাসীদেরকে

প্রচণ্ড ভয় ও হতাশার শিকার দেখতে পাই। এর কারণ, প্রায় এক মাস পূর্বে এখানকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা পাকিস্তানী ও হিন্দুস্থানী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এমন এক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, যেখানে লুটতরাজ, খুন–খারাবী ও নারীদের ইজ্জত নষ্ট করার মত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। যার নজীর অতীতে পাওয়া যায় না। এই বিপর্যয়ের ফলে অনেক বড় বড় মুসলমান ব্যবসায়ী একেবারে হতদরিদ্র হয়ে যায়, অনেকে গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং সবচেয়ে বড় কথা, অনেক নারীর উপর অপরাধমূলক আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যে কারণে এখন এখানকার বিদেশী মুসলমানগণ মারাত্মকভাবে আতংকগ্রস্থ হয়ে আছে।

এখানকার পাকিস্তানী অধিবাসীরা এক রাতে খানার দাওয়াতের সময় আমাকে এসব ঘটনা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শোনায়। সকলে এক বাক্যে বলে যে, এখন এদেশে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের জান, মাল ও আবরু সবসময় আশংকায় রয়েছে। তাই আমরা পাকিস্তান ফিরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে চাই।

এসব ঘটনা শুনে মন অত্যন্ত দুঃখিত হলো। নিঃসন্দেহে এখন অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এদের এই দুশ্চিন্তা যথার্থ ও সম্পূর্ণ সঠিক। মুসলমান সরকারদের তাদের এই সমস্যার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

কিন্তু এর সাথে সাথে অধম সেসব বন্ধুর নিকট একথাও তুলে ধরি যে, আমাদের এ দিকটি নিয়েও ভাবা দরকার যে, বছর বছর ধরে এই দেশে বসবাস করা সত্ত্বেও এমন বেদনাপূর্ণ ঘটনার পরিস্থিতি কি করে সৃষ্টি হল? মুসলমানদের ইতিহাস বলে যে, তারা পৃথিবীর যে ভূখণ্ডেই গিয়েছে, সেখানেই তারা অনুপম আদর্শ, উত্তম চরিত্র, ভালবাসা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে সবসময় স্থানীয় অধিবাসীদের মন জয় করেছে। কিন্তু এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে যে, মুসলমান দেশত্যাগীরা সব জায়গায় স্থানীয় অধিবাসীদের নজরে কাঁটার মত বিঁধে। মাত্র কিছুদিন পূর্বে উগাণ্ডায় তাদের সাথে এমনই আচরণ করা হয়। তারা সেখান থেকে কেনিয়াতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেনিয়ার ভূখণ্ডও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

যদি এই পরিস্থিতির বাস্তবভিত্তিক কারণ সন্ধান করা হয়, তাহলে এর বড় একটি কারণ এই দেখা যাবে যে, স্থানীয় অধিবাসীদের পশ্চাদপদতা ও মূর্খতা প্রভৃতির কারণে তাদের সাথে আমাদের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের হয়ে থাকে। ইসলাম আমাদেরকে যে আচরণ শিখিয়েছে তাদের সাথে আমাদের সেই আচরণ হয় না। আমরা সেসব দেশে গিয়ে সম্পদ বাড়ানোর চিন্তায় লিপ্ত হয়ে যাই। অন্যান্য অমুসলিম জাতির মত স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তাচ্ছিল্য ও হেয়তাপূর্ণ আচরণ করি। আমরা যদি তাদেরকে ভালবাসা ও হৃদ্যতা দিতে পারতাম, তাদের দুঃখ বেদনায় শরীক হতে পারতাম, তাদের পশ্চাদপদতা দূর করতে এবং তাদেরকে ইসলামী আখলাকে সজ্জিত করার জন্য মেহনত করতে পারতাম, তাহলে তাদের অন্তরে আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার পাহাড় সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা সেসব দেশের উপকরণ সামগ্রী দ্বারা সব ধরনের পার্থিব লাভ অর্জন করা সত্ত্বেও সে দেশের পশ্চাদপদ অধিবাসীদের জন্য কোন অর্থ এবং কোনরূপ শ্রম ব্যয় করতে প্রস্তুত হই না। মাশাআল্লাহ কিছু ব্যতিক্রমতো আছেই। তাছাড়া গরীবদের সাহায্য করার আগ্রহ যাদের রয়েছে, সাধারণত তাদের সাহায্যমূলক অর্থও স্থানীয় অধিবাসীদের উপর ব্যয় না হয়ে তাদের বাপ-দাদার দেশে ব্যয় হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের বাড়ীতে ও দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করে। কিন্তু খুব কম মানুষই এমন আছে, যারা তাদের সাথে ভালবাসা ও হৃদ্যতার আচরণ করে তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে সজ্জিত করার চেষ্টা করে থাকে। আর যখন আমরা নিজেরাই ইসলামী শিক্ষা থেকে কার্যত অপরিচিত হব তখন অন্যদেরকে কিরূপে শিক্ষা দান করব?

আমার দৃষ্টিতে যেসব মুসলমান জীবিকার সন্ধানে ভিনদেশে বসবাস করছে, উগাণ্ডা ও কেনিয়ার এসব অবস্থা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। কোন দেশ থেকে বিস্তর পরিমাণ বসতি স্থানান্তর করা সহজ ব্যাপার নয়। আর বহির্দেশে বসবাসকারী সকলে ফিরে এসে বাপ-দাদার দেশে বসবাস শুরু করা সম্ভবও নয়। তবে তারা নিজেদের জীবনের উপর পুনর্দৃষ্টি ফেলে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে নিজেদের কর্মপন্থা অবশ্যই

পরিবর্তন করতে পারে। মুসলমানদের জীবনের লক্ষ্য শুধুমাত্র জীবিকা উপার্জনের দ্বারাই পূর্ণ হয় না, বরং তাদের জীবনের আসল লক্ষ্য নিজে মুসলমান হওয়া এবং অন্যান্যদেরকে মুসলমান বানানো। যতদিন মুসলমানগণ তাদের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেছে, তারা যেখানেই গেছে সকলের মনের মানুষ হয়েছে। আর যখন থেকে তারা এই লক্ষ্যকে দূরে ফেলে শুধুমাত্র খাদ্য লাভ ও অর্থ উপার্জনের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে, তখন থেকে জায়গায় জায়গায় এ জাতীয় বিভিন্ন দুর্ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এখনও যদি আমরা নিজেদের জীবন–লক্ষ্যের দিকে ফিরে আসি, তাহলে এটি আমাদের দ্বীনেরও চাহিদা এবং এটিই আমাদের মুক্তির পথ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সত্যের সঠিক উপলব্ধি দান করে সেই মত জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রত্যাবর্তন

নাইরোবীতে জুমুআর দিন অতিবাহিত করার সুযোগ হয়। সেখানকার কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমুআর সময় অধমের ইংরেজীতে কিছু দ্বীনি কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়। তারপর জুমুআর রাতেই সেখান থেকে রওয়ানা করে আল্লাহর ফজলে আল্লাহর ঘরে হজ্জ করার এবং পবিত্র মদীনা যিয়ারত করার সৌভাগ্য হয়। দুই সপ্তাহকাল হারামাইন শরীফাইন অর্থাৎ মক্কা–মদীনার পবিত্র ছায়ায় অতিবাহিত করে ১লা অক্টোবর করাচী পৌঁছি। আল্লাহ তাআলা এই সফরে সংঘটিত পাপসমূহ নিজ দয়ায় মাফ করে দিয়ে এই সফরকে তাঁর দরবারে কবুলিয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করুন। আমীন।

পাশ্চাত্য জগতে তিন সপ্তাহ

কানাডা, আমেরিকা, ফ্রান্স সফর

সফরকাল ঃ ১৪০৯ হিজরী
অক্টোবর, ১৯৮৮ ঈসায়ী

یہ عیشِ فراواں، یہ حکومت، یہ تجارت
دل سینۂ بے نُور میں محرومِ تسلی
تاریک ہے افرنگ مشینوں کے دُھویں سے
یہ وادیٔ ایمن نہیں شایانِ تجلّی

ঐশ্বর্যের এই প্রাচুর্য, এই রাজত্ব আর এই বাণিজ্য,
ঈমানের নূরহারা বক্ষমাঝের হৃদয়ে নেই প্রশান্তি
মেশিনের ধোঁয়ায় অন্ধকার ছেয়ে গেছে পাশ্চাত্য জগতে
এই (অভিশপ্ত) প্রান্তরে খোদায়ী নূরের তাজাল্লি প্রাপ্তির
নেই যোগ্য।

কানাডা

কানাডা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বহু সংখ্যক মুসলমানও এখন সেখানে বসতি স্থাপন করেছে। কানাডার কিছুসংখ্যক মুসলমান সেখানে যাওয়ার জন্য কয়েকবার অধমকে দাওয়াত দিয়েছে। কিন্তু বহুবিধ কারণে তা পুরা করতে পারিনি। পরিশেষে তাদের কয়েকজন শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (কুঃ সিঃ)এর খলীফা হযরত ডঃ মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব (মুঃ যিঃ)এর সঙ্গে যোগাযোগ করে অধমকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাঁকে মাধ্যম বানায়। হযরত ডঃ মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব (মুঃ যিঃ)এর সঙ্গে অধমের দীর্ঘদিনের ভক্তসুলভ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি হযরত শাইখুল হাদীস সাহেব (কুঃ সিঃ)এর খিদমাত ও সুহবাত দ্বারা ফয়েয লাভ করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি সৌদী আরবে বসবাস করেন। বর্তমানে কানাডার ওয়াটারলো শহরে বাস করছেন।

হযরত ডঃ সাহেব (মুঃ যিঃ) অধমকে পত্রযোগে তাদের বাসনা অবহিত করেন এবং কানাডার মুসলমানদের কিছু সমস্যার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমি তখন সেখানে যাওয়ার ওয়াদা করি। প্রথমে শাওয়াল মাসে সফর করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আমার কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় পরিশেষে সফর মাসের মাঝামাঝি সময়ে সেখানে যাওয়ার ওয়াদা করি।

২১শে সফর ১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ৩রা অক্টোবর ১৯৮৮ ঈসায়ী দিবাগত রাত তিনটায় এয়ার ফ্রান্সের বিমানযোগে আমি যাত্রা করি। প্যারিসের পথে সফর হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেখানে আমাকে ২৪ ঘন্টা অবস্থানও করতে হবে। করাচী থেকে বিরতিহীন আট ঘন্টা সফর করে প্যারিসের আকাশে পৌঁছি। তখন পাকিস্তানে দিনের এগারোটা বেজে থাকবে। কিন্তু এখানে ছিল সকাল ৭টা। বিমান যথাসময়ে প্যারিসে পৌঁছে। কিন্তু অবতরণের চেষ্টা করে জানতে পারে যে, প্রচণ্ড কুয়াশার দরুন এখন অবতরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিমান আরো দুই ঘন্টা আকাশে চক্কর দিতে থাকে। অবশেষে ৯টার সময় অবতরণের অনুমতি পায়। এভাবে সফরটি একাধারে দশ ঘন্টার হয়।

এয়ারপোর্টের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে হোটেলে পৌঁছতে আরো তিন ঘন্টা সময় লাগে। দুপুর বারোটায় আমি হোটেলে পৌঁছতে সক্ষম হই। প্যারিসে অবস্থানকালে আমার একটি লাইব্রেরী দেখার ইচ্ছা ছিল। তাছাড়া জনাব ডঃ মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গেও সাক্ষাত করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সারারাতের অনিদ্রা ও ক্লান্তির পর আর সাহস হল না। আসর পর্যন্ত আমি হোটেলেই বিশ্রাম করি। আসরের সময় আলজেরিয়ান এক বন্ধু আমাকে এখানকার তাবলীগী মারকায 'মসজিদে রহমতে' নিয়ে যায়। সেখানে তাবলীগের বন্ধুদের সাথে সাক্ষাত হয়। মাগরিব নামায সেখানেই পড়ি। পরে এক বন্ধু আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যায়।

পরদিন সকাল ৯টাতেই আমি বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্র' করি। এখান থেকে বিমান বন্দর বেশ দূরে। সকাল বেলায় প্যারিসের ব্যস্ত সড়কগুলোতে ট্রাফিক জ্যামের কারণে গাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। উন্নত দেশসমূহেও এ সমস্যাটি মানুষের জন্য এক আযাব হয়ে আছে। এ কারণেই সেসব বড় বড় শহরের লোকেরা গাড়ীর মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভূগর্ভস্থ রেলযোগে ভ্রমণ করা অধিক পছন্দ করে। কারণ এতে বেশি সময় ব্যয় হয় না।

যাই হোক, ট্যাক্সি শহরের ব্যস্ত এলাকা ধীরে ধীরে অতিক্রম করে। প্রায় দেড় ঘন্টায় চার্লস ডেগাল বিমান বন্দরে পৌঁছে। ট্যাক্সিকে ১৬০ ফ্রাঙ্ক ভাড়া পরিশোধ করি। যা পাকিস্তানী টাকায় এক হাজার টাকার কিছু কম। প্যারিসের দ্রব্যমূল্য এত বেশি যে, আমার মত মানুষ দু' চার দিনেই সহজে দেওলিয়া হতে পারবে।

দুপুর সাড়ে বারটায় এয়ার ফ্রান্সের বিমান টরোন্টোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অবিরাম ৭ ঘন্টা আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে উড়ার পর মান্টারিয়াল অবতরণ করে। কিন্তু তখনও আসরের সময় হয়নি। বিমান এখানে প্রায় এক ঘন্টা বিরতি করে। পরবর্তী যাত্রার একটু পূর্বে আমি আসর নামায পড়ে নেই।

এখান থেকে টরেন্টো পর্যন্ত আরো এক ঘন্টার সফর বাকী ছিল। স্থানীয় সময় মতে, বিকাল সাড়ে পাঁচটায় বিমান টরেন্টোয় অবতরণ করে। বিমান বন্দরে হযরত ডঃ মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব (মুঃ যিঃ)

আমার মেজবান মুহাম্মাদ শামীম সাহেব দেহলভী, আবদুল হাই পেটেল সাহেব, আমার ভায়রা ভাই সেকেন্দার সাহেব এবং আরো কিছু বন্ধু স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।

টরেন্টো থেকে প্রায় ৮০ কিঃ মিঃ দূরে ওয়াটার লো নামে একটি শহর আছে। হযরত ডঃ মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব সেখানে বাস করেন। আমার মেজবান এভাবে প্রোগ্রাম তৈরী করেন যে, টরেন্টোতে কাজ শুরু করার পূর্বে একদিন ওয়াটার লোতে হযরত ডঃ সাহেবের বাসস্থানে নির্দিষ্ট কোন কাজ ছাড়া অতিবাহিত করা, যেন সেখানে বিশ্রামও করা হয় এবং সেখানকার মসজিদ মাদ্রাসা পরিদর্শন এবং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনাও করা হয়। সুতরাং আমরা বিমানবন্দর থেকে ওয়াটার লোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

এ অঞ্চলে শীত প্রায় আসন্ন ছিল। ঋতু বেশ ঠাণ্ডা তবে মনোরম। গাড়ি পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত মহাসড়কের উপর দিয়ে দৌড়ে চলছে। উভয়দিকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সবুজ ভূমি বিস্তৃত। কোন জায়গা শ্যামলিমা শূন্য ও শুষ্ক দেখা যাচ্ছিল না। সর্বাধিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল সেসব সুদৃশ্য বৃক্ষ, যেগুলোতে হেমন্তের নিদর্শনরূপে বসন্তের আগমন ঘটেছিল। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে নিজে নিজে গজিয়ে ওঠা অনেক গাছে কুদরতের এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখা যায় যে, হেমন্তের পূর্বে তার সবুজ পাতা রং পাল্টাতে আরম্ভ করে। গাছের কিছু অংশ হলুদ এবং কিছু অংশ লাল হয়ে যায়। এর হরিদ্রতা ও লালিমা কোথাও হালকা আবার কোথাও গাঢ় হয়। যে কারণে পুরো বৃক্ষটি সুন্দর রংসমূহের এক মনোমুগ্ধকর সমষ্টি হয়ে যায়। যে সব বনে এসব বৃক্ষ বেশি থাকে বিশেষভাবে সেখানে বিচিত্র রং বিশিষ্ট এই বৃক্ষরাজি অতীব সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করে। অনেকে এই দৃশ্য দেখার জন্য বহু দূর থেকে সফর করে আসে। হেমন্তের আগমনে বৃক্ষরাজির এই বাহার আমি আর কোন দেশে দেখিনি।

এখানে পথের কোন কোন জায়গায় আবহাওয়ার গতি বোঝানোর জন্য বিদ্যুত চালিত মিটার বসানো আছে। সেগুলো আলোকিত সংখ্যার মাধ্যমে তাপমাত্রা বুঝিয়ে থাকে। এমনি একটি বোর্ড এ সময় তাপমাত্রা ১ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড জানাচ্ছিল।

ওয়াটার লো শহরে

মাগরিবের সময় আমরা ওয়াটার লো পৌঁছি। ছোট্ট একটি শহর। বসতি ২৫/৩০ হাজার। তার মধ্যে হাজার বারশ' মুসলমানও আছে। একটি মসজিদও আছে। তাতে হযরত ডঃ মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেবের ছেলে ইমামতি এবং শিশুদের পাঠদানের দায়িত্ব পালন করেন। মসজিদের অদূরেই হযরত ডঃ সাহেবের বাড়ি। আমরা সেখানেই অবস্থান করি। এশার পর যখন আহার শেষ করি, তখন এখানে রাত্রি ৯টা। কিন্তু প্যারিসের হিসাবে রাত দুটা, আর পাকিস্তানের হিসেবে সকাল ৬টা বেজে গেছে। অধিক ক্লান্তিতে মাথা ঘুরছিল। কোন মানুষ প্রাচ্যের দেশ থেকে সফর করে আমেরিকা বা কানাডায় গেলে সময়ের ব্যবধানের কারণে দুই একদিন পর্যন্ত নিদ্রা ও জাগরণে গড়বড় হয়ে যায়। দিনের বেলায় ঘুম আসে, আর রাত্রিতে তা উধাও হয়ে যায়।

যাই হোক, সে রাতে খাবার খেয়ে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাই। পরদিন দিনের বেলাও বিশেষ কোন প্রোগ্রাম করা হয়নি। নাস্তার পর হযরত ডঃ সাহেব এবং অধমের মেজবান (নিমন্ত্রণকারী) মুহাম্মাদ শামীম সাহেব, যিনি টরেন্টো থেকে আমাদের সঙ্গেই এখানে এসেছিলেন, কানাডা এবং এখানকার মুসলমানদের বিভিন্ন অবস্থা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন।

কানাডা আয়তনের দিক থেকে রাশিয়ার পর বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র। এর বিভিন্ন অঞ্চলে তিন ধরনের সময় চালু আছে। দেশটি পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত। প্রথমদিকে এটি ইংরেজদের নতুন বসতি ছিল। এক সময় ফরাসীরা এটি দখল করে নেয়। এখন পুনরায় ইংরেজদের আধিপত্যে এসেছে। ফরাসীদের বিরাট সংখ্যক লোক এখানে আবাদ রয়েছে। কোয়েবাক প্রদেশে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রেসিডেন্ট টোরাডোর যুগ থেকে সারা দেশের জন্য দুটি সরকারী ভাষা নির্ধারণ করা হয়। একটি ইংরেজী এবং অপরটি ফরাসী।

সে দেশে বিরাট সংখ্যক মুসলমানও আবাদ রয়েছে। টরেন্টো দেশের সর্ববৃহৎ শহর। এখানকার মুসলমানদের সংখ্যা এক লাখের অধিক বলা

হয়। তার মধ্যে বিশ্বের প্রায় সকল ভূখণ্ড থেকে আগত মুসলমান শামিল রয়েছে। তাদের সঙ্গে সেখানকার মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। যেগুলো ধীরে ধীরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আসর নামাযের পর আমরা ওয়াটার লো থেকে রওয়ানা হই। এখান থেকে প্রায় চল্লিশ কিঃ মিঃ দূরে কেম্ব্রীজ নামে আরেকটি শহর আছে। এখানেও একটি মসজিদ আছে। এখানে ডঃ সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে ইমামতি ও পাঠদানের দায়িত্ব পালন করেন। মাগরিব নামাযের পর এখানে অধমের বক্তৃতার প্রোগ্রাম ছিল। এখানেই আমরা মাগরিবের নামায আদায় করি। নামাযান্তে এশা পর্যন্ত অধমের বক্তব্য চলতে থাকে। অধম সূরা মূলকের এই আয়াত পাঠ করি—

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ○

অর্থ তিনিই আল্লাহ, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাই তোমরা তার উচ্চ ভূমিসমূহে চলাফেরা কর এবং তার রিযিক থেকে ভক্ষণ কর এবং তাঁর সমীপেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা মুলক)

এই আয়াতের আলোকে অধমের আলোচনার বিষয়বস্তু এই ছিল যে, জীবিকার সন্ধানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া এই আয়াতের ভিত্তিতে জায়েয প্রমাণিত হয়। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে তাঁর দান মনে করে কথায় ও কাজে তাঁর শোকর আদায় করতে হবে এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে একথা স্মরণ রাখতে হবে। এ কথাগুলো মনে রাখলে অন্যান্য দেশেও মানুষ নিজের ঈমান ও আমলকে নিরাপদে রাখতে পারবে।

এশার পর কেম্ব্রীজের এক বন্ধুর বাড়িতে খানার প্রোগ্রাম ছিল। খানা খাওয়ার পর আমরা টরেন্টো অভিমুখে যাত্রা করি এবং রাত সাড়ে এগারটার কাছাকাছি সময়ে আমরা ানে পৌঁছি।

টরেন্টো নগরীতে

পরদিন জুমাবার। টরেন্টোর সর্ববৃহৎ মসজিদ 'মসজিদে মদীনা'তে জুমুআর নামায আদায় করতে হবে। জুমুআর দিন এখানে ছুটি থাকে না বিধায় মানুষ দুপুরের খাবারের বিরতিতে নামাযের জন্য আসে। এজন্য এসব অঞ্চলে জুমুআর নামাযের পূর্বে মাত্র দশ মিনিটের অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দানের নিয়ম। আজ আমাকে এই বক্তব্য দান করতে হবে। যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছে। মসজিদ মানুষে পরিপূর্ণ। আমি সংক্ষিপ্ত এই ভাষণে নিজের পরিবার এবং বিবি–বাচ্চার দ্বীনী তারবিয়ত অর্থাৎ ধর্মীয় প্রশিক্ষণের উপর জোর দেই। তারপর এরই সারাংশ আরবী খুৎবাতে বয়ান করি এবং জুমুআর নামায পড়াই।

মসজিদের কাছেই ফারনেক ডেল আয়োনিওতে আহমাদ দাউদ সাহেবের বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি নিজেই বাড়ির নিচের অংশে অবস্থান করেন, আর উপরের তিন কক্ষ আমাদের জন্য ছেড়ে দেন। এতে করে আমাদের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্যও সুবিধা হয়।

এশার নামাযের পর সেই আল মদীনা মসজিদেই বিস্তারিত বক্তব্যের প্রোগ্রাম ছিল। সে মজলিসে অনেক লোক অংশগ্রহণ করে। আমি প্রায় দেড় ঘন্টার এই ভাষণে সকালে প্রদত্ত সেই বিষয়টিই কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি এবং নেক সোহবত তথা আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য লাভের প্রতি গুরুত্বারোপ করি।

শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মানুষ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতে থাকে। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা শামীম সাহেবের বাড়ীতে হয়। শনিবার দিন ছুটির দিন। তাই সেদিন পরপর তিনটি ভাষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং তিনটি ভাষণই জামে মসজিদে হয়।

জামে মসজিদটি টরেন্টোর প্রাচীনতম মসজিদ। এর আশেপাশে বিরাট সংখ্যক আরব মুসলমান বাস করে। এরা শনিবার যোহর নামাযের পর কোন না কোন ধর্মীয় সমাবেশ করে থাকে। আজ তারা অধমকে বক্তৃতা দানের জন্য দাওয়াত দিয়েছিল। সুতরাং যোহর পর প্রায় ১ ঘন্টা সময় তাদের সামনে আরবীতে ভাষণ দেই। উপস্থিত লোকদের মধ্যে প্রায় সকল আরব দেশের লোকই ছিল। আমি জানতে পেরেছিলাম যে,

আরবদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে যুক্তিনির্ভর কৌশল ও প্রজ্ঞাকে 'বিচারকের' মর্যাদা দানের রেওয়াজ ব্যাপকতা লাভ করেছে। তাই আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ধর্মে যুক্তির গুরুত্ব ও তা ব্যবহারের সীমারেখা'। আলহামদুলিল্লাহ এ আলোচনায় অনেকের অনেক সন্দেহ দূরীভূত হয়। বক্তব্যের পর প্রশ্ন–উত্তরের ধারা শুরু হয়। বেশির ভাগ প্রশ্ন ফেকাহ বিষয়ক এবং কানাডার মুসলমানদের সামনে উদ্ভূত সমস্যাবলী সংক্রান্ত ছিল। আমি প্রশ্ন–উত্তরের এ ধারা মাঝপথেই সমাপ্ত করতে চাই। কিন্তু উপস্থিত সুধীবৃন্দ তখনও পরিতৃপ্ত হননি বলে জানালেন। বিধায় আরো প্রায় পৌনে এক ঘন্টা এই ধারা চলতে থাকে। আল্লাহর মেহেরবানীতে তা বেশ উপকারী প্রমাণিত হয়।

মাগরিব নামাযান্তে ঐ মসজিদেই তাবলীগী ইজতিমা ছিল। সেখানেও সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করি। এশার নামাযান্তে এখানেই উর্দূ ভাষায় সবিস্তারে আলোচনার ঘোষণা করা হয়েছিল। এই আলোচনা প্রায় এক ঘন্টা চলতে থাকে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে যারা উর্দূ জানতেন না তাদের জন্য মসজিদের এক কোণায় সাথে সাথে ইংরেজীতে তরজমা করা হচ্ছিল।

পরদিন ছিল রবিবার। যোহর নামাযের পর স্কারবো কমিউনিটি সেন্টার হলে পুরুষ ও নারীদের পর্দাসম্মত সমাবেশ ছিল। ঐ দিনই রাতে এশার পর আরেকটি মসজিদে বক্তৃতা দানের প্রোগ্রাম ছিল।

ঘটনাক্রমে সোমবার দিনও সরকারী ছুটি ছিল। এখানের নিয়ম এই যে, ফসল কাটা শেষ হলে সরকারীভাবে 'কৃতজ্ঞতা দিবস' (Thanking giving day) পালন করা হয়। সুতরাং সোমবার কৃতজ্ঞতা দিবস পালন করা হচ্ছিল। ফলে সেদিনও তিনটি প্রোগ্রাম রাখা হয়।

উত্তর আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে) মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকাকে মনে করা হয়। এটি এখানে 'ইসনা' (Isna) নামে প্রসিদ্ধ। জনাব মুহাম্মাদ আশরাফ সাহেব এই সংগঠনের কানাডা শাখার চেয়ারম্যান। তারই এক বন্ধু পারভেজ নাসীম সাহেব মুসলমানদের জন্য বাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এখানে একটি 'হাউজিং কোঅপারেট কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসনার

অফিসেই এর কেন্দ্র। সোমবার সকাল দশটার সময় তারা দু'জনে অধমকে এই স্কীমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শরীঅতের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা–ভাবনা ও মত বিনিময় করার দাওয়াত দিয়েছিল এবং দুপুরের খাওয়ার প্রোগ্রামও সেখানেই ছিল।

আমেরিকা ও কানাডায় বাড়ি পাওয়া বিরাট এক সমস্যা। এর সমাধানের জন্য এখানে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যে, ব্যাংক এর জন্য সুদভিত্তিক ঋণ দান করে। যা কয়েক বৎসর মেয়াদী পরিশোধযোগ্য হয়। এখানে বাড়ি ভাড়া এত বেশি যে, সুদভিত্তিক এ ঋণের মাসিক কিস্তি বাড়ি ভাড়ার প্রায় সমান সমান। এজন্য মানুষ ভাড়া বাড়িতে না থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি ক্রয় করে এবং এর মাসিক কিস্তি আদায় করতে থাকে।

মুসলমানদের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ পাক দ্বীনের ফিকির দান করেছেন, তারা এই পন্থায় এ জন্য উপকৃত হতে পারেন না যে, এভাবে তাদেরকে হারাম সুদী কারবারে লিপ্ত হতে হয়।

এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পারভেজ নাসীম সাহেব ইসনার সহযোগিতায় ইসলামিক কোঅপারেট হাউজিং কর্পোরেশন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুসলমানদেরকে বাড়ি ক্রয়ের উপযুক্ত সুদবিহীন ঋণ প্রদান ও ব্যবস্থা করা এর উদ্দেশ্য। কিন্তু যে স্কীম নিয়ে কর্পোরেশনটি কাজ করে যাচ্ছে, এখানকার আলেমরা সে পন্থাকেও নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। কানাডা আসার পর এ ব্যাপারে প্রায় প্রত্যেকটি মজলিসে আমাকেও জিজ্ঞাসা করা হতে থাকে। কর্পোরেশনের দায়িত্বশীল লোকদের থেকে এর কর্মপন্থা বুঝে নিয়ে এ ব্যাপারে আমার মতামত যেন পেশ করতে পারি এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়।

সুতরাং আমি হযরত ডঃ মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব (মুঃ যিঃ)এর সঙ্গে তাদের অফিসে যাই। দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাদের নিয়মাবলী, কর্মধারা ও কায়কারবারের পদ্ধতি সবিস্তারে দেখার পর এই ফলাফলে উপনীত হই যে, শরীঅতের দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও বর্তমানের প্রচলিত স্কীমে বিভিন্ন ত্রুটি বিদ্যমান, কিন্তু তা দূর করা খুব জটিল নয়। পরিশেষে

সিদ্ধান্ত হয় যে, আমি কর্পোরেশনের মুদ্রিত দলিল–দস্তাবেজ এবং বাস্তব সমস্যাবলী নিরীক্ষা করে পরবর্তী কোন বৈঠকে সেই সংশোধনী তুলে ধরব, যার মাধ্যমে এসব ত্রুটি বিদূরিত হবে। সুতরাং পরবর্তী সোমবার সন্ধ্যায় পরবর্তী মিটিংএর সিদ্ধান্ত নিয়ে এই বৈঠক সমাপ্ত হয়।

যোহর নামাযের পর বেলা দুইটায় বিমব্লে কমিউনিটি সেন্টার হলে এবং এশার নামাযের পর বিমব্লেরই মসজিদে বক্তৃতা হয়। এর মধ্যবর্তী সময় মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের বাড়ীতে অতিবাহিত হয়। মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব গুজরাটের একটি মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তিনি জালালাবাদে হযরত মাওমানা মুহাম্মাদ মাসীহউল্লাহ খান সাহেব (মুঃ যিঃ)এর মাদ্রাসায় ইফতার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে এখানকার একটি মাদ্রাসায় অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করছেন। কানাডায় মানুষ ধর্মীয় সমস্যাবলী সমাধানের জন্য তার শরণাপন্ন হয় এবং তিনি ফাতাওয়ার কাজও সম্পাদন করে থাকেন। মাশাআল্লাহ! তিনি শালীন স্বভাবী, বিনয়ী এবং সরল প্রকৃতির যুবক। তিনি অধমকে ভালবেসে অনেক শ্রদ্ধা করেন। টরেন্টো অবস্থানকালে অনেক সময় আমার সঙ্গে থাকেন এবং এখানকার ফেকাহ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। এ অঞ্চলেই তার বাড়ী। অপরাহ্ন থেকে এশা পর্যন্ত তার বাড়ীতেই অবস্থান করি। রাতের খাবার সেখানেই খাওয়া হয়।

পরদিন ১১ই অক্টোবর সকালে আমরা পাকিস্তানের কাউন্সিল অফিসে যাই। এখানে পাকিস্তানের কাউন্সিল অফিসের প্রধান অফিসার আফজাল আকরাম সাহেবের সাথে সাক্ষাত হয়। মাশাআল্লাহ! তিনি সৎ স্বভাবী, মিশুক ও কর্মতৎপর ব্যক্তি। টরেন্টোর পাকিস্তানীরা তার কার্যকলাপে আনন্দিত। তার নিকট থেকে পাকিস্তানের নতুন কিছু সংবাদ জানতে পারি।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত

সেদিনই আমার মেজবানগণ পৃথিবীর প্রসিদ্ধতম জলপ্রপাত নায়াগ্রা ভ্রমণের প্রোগ্রাম রেখেছিলেন। নায়াগ্রা টরেন্টো থেকে প্রায় সোয়াশ' কিঃ মিঃ দূরে। হযরত ডঃ মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব ও আবদুল কাদের

সাহেব আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। যোহর নামাযের পর আমরা টরেন্টো থেকে যাত্রা করি। সড়ক অনেক চওড়া ও পরিচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু ট্রাফিক জ্যামের কারণে প্রায় দুই ঘন্টায় এই সফর অতিক্রম করা হয়। নায়াগ্রা ভিন্ন একটি শহর। এরই তীরে সেই জগত খ্যাত জলপ্রপাত অবস্থিত, যা তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কারণে সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ এবং পৃথিবীর বিস্ময়কর বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

কুদরতের এই কারিশমার খ্যাতি তো বাল্যকাল থেকেই শুনে এসেছি। কিন্তু তার হৃদয়গ্রাহী সেই দৃশ্য যা দেখে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে —

فتبارك الله احسن الخالقين

অর্থ ঃ "অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ" বলে ওঠে। আজ তা প্রথমবার আমার দেখার সৌভাগ্য হল।

নায়াগ্রা মূলত একটি নদী। এটি আমেরিকার পৃথক পৃথক চারটি প্রাকৃতিক ঝিলের সমন্বয়ে গঠিত। যার উপরিভাগের মোট আয়তন দুই লক্ষ ষাট হাজার বর্গমাইল। এই নদী আমেরিকা এবং কানাডার মাঝে সীমান্ত রেখারও কাজ করে। নদীটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে কানাডার প্রসিদ্ধ ঝিল অন্টারেভে পতিত হয়।

যে জায়গায় নদীটি বিশ্বের প্রসিদ্ধতম জলপ্রপাতের রূপ ধারণ করেছে, সেখানে নদীর প্রবাহ পথে একটি অতি গভীর, দীর্ঘ ও প্রশস্ত খাদ প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। নদীটি যখন প্রশস্ত আয়তনে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে এই খাদের প্রান্তে পৌঁছে, তখন পানির প্রচণ্ড ধারা তীব্রগতিতে ঐ খাদে পতিত হয়। এতে করে পুরো নদীটিই জলপ্রপাতের রূপ ধারণ করে। এই খাদের পশ্চিম প্রান্ত কানাডায়। তার আকৃতি খুরের ন্যায়। এজন্যই একে Horse shoe Falls অর্থাৎ অশ্ব খুরাকৃতির জলপ্রপাত বলা হয়। নদীর বেশি অংশ এখান থেকেই খাদে পতিত হয়। অপরদিকে এখান থেকে সর্বোচ্চ এক ফার্লং দূরে খাদের দক্ষিণ প্রান্ত আমেরিকায় অবস্থিত। পানির অবশিষ্টাংশ পাক খেয়ে সেই তীর থেকে নীচে পতিত হয়, যাকে আমেরিকান জলপ্রপাত বলা হয়।

কানাডার 'খুরাকৃতি জলপ্রপাত' চাঁদের মত অর্ধবৃত্তাকারের। এই

অর্ধবৃত্তের ব্যাস ২ হাজার ৬শ ফুট। খাদের পিঠ থেকে এর উচ্চতা ১৬২ ফুট। যেন এখান থেকে নদীর বেশির ভাগ পানি অর্ধবৃত্তরূপে পঞ্চাশ মিটারের অধিক উঁচু থেকে খাদে পতিত হয়। যার তীব্র আওয়াজ দূর থেকে শোনা যায় এবং তার উড়ন্ত ছিটা খাদের নীচের পিঠ থেকে উঁচু হয়ে নদীর আসল পিঠ থেকেও উপরে চলে যায়। সেই ছিটার কারণে সবসময় জলপ্রপাতের সম্মুখে একটি সাদা মেঘখণ্ড ভাসতে দেখা যায়। বলা হয় যে, এখান থেকে প্রতি মিনিটে ছয় কোটি গ্যালন পানি পতিত হয়। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, পানির এই প্রচণ্ড সয়লাব এখানে কোটি কোটি বছর ধরে এমনি প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এটি আল্লাহ পাকের আজব কারিশমা যে, যে কিনারা দিয়ে এই লক্ষ লক্ষ টন পানি এমন ভয়ানক চাপ সহকারে পতিত হয়, লক্ষ লক্ষ শতাব্দী ধরে তার মাত্র কয়েক ফুট জায়গা এ পর্যন্ত পানির সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়েছে। অবশিষ্ট জায়গা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

অর্থ ঃ অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।

জলপ্রপাত দর্শনের জন্য এখানে দীর্ঘ একটি সড়ক এবং সড়কের পাশে একটি ফুটপাত রয়েছে। সড়কটি জলপ্রপাতের মুখ থেকে শুরু হয়ে খাদের সাথে সাথে দূর পর্যন্ত চলে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিক থেকে নদীর প্রবাহিত হওয়া অতঃপর অকস্মাৎ তা খাদে পতিত হওয়ার দৃশ্য এতই হৃদয়গ্রাহী ও বিস্ময়কর যে, মানুষ তা দেখে আত্মহারা হয়ে যায়। এই সড়কের নীচ থেকে একটি সুড়ঙ্গ পথ বের হয়ে গর্তের ঐ নীচের পৃষ্ঠে চলে গেছে যেখানে এসে দৈত্যাকৃতির এই নদী পতিত হয়। এখানে একটি প্লাটফর্ম বানানো আছে। সেখান থেকে মানুষ রেইনকোট পরে জলপ্রপাত নিজের সম্মুখে পতিত হওয়ার দৃশ্য দেখে। রেইনকোট এজন্য পরতে হয় যে, এছাড়া নদীর তীব্র ছিটা থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব নয়।

খাদের তীর ধরে সড়কপথে পূর্বদিকে কিছুদূর যাওয়ার পর খাদের দক্ষিণ পাড়ে আমেরিকান জলপ্রপাত পতিত হতে দেখা যায়। এই জলপ্রপাতটি সোজা। এর প্রস্থ ১০০০ ফুট, যা কানাডার জলপ্রপাতের

তুলনায় কম। এটি ১৬৬ ফুট উঁচু থেকে খাদে পতিত হয়। জলপ্রপাতটি সোজা পতিত হওয়ার কারণে পানির পরিমাণ এবং তার প্রবাহের তীব্রতাও অত বেশি নয়। তাই একে কানাডার খুরাকৃতির জলপ্রপাতের তুলনায় ম্লান মনে হয়। আরেকটু পূর্ব দিকে এগিয়ে খাদের উপর একটি সুদৃশ্য পুল নির্মাণ করা হয়েছে। এটি Rainbow Bridge 'ধনুক পুল' নামে প্রসিদ্ধ। পুলটি উত্তর দক্ষিণে কানাডা ও আমেরিকার মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। পুলের মাঝামাঝি ইমিগ্রেশন পোষ্ট বানানো হয়েছে। পাসপোর্ট সাথে থাকলে পুলের উপর দিয়ে আমেরিকার পর্যটক কানাডার অংশ এবং কানাডার পর্যটক আমেরিকার অংশ দেখতে আসতে পারে।

নায়াগ্রার বিনোদন উপভোগ করার জন্য জলপ্রপাতের উত্তরে অতি সুন্দর পার্ক, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও বিনোদনমূলক অনেক কেন্দ্র রয়েছে। এ কারণেই এই জায়গাকে বিশ্বের সুন্দরতম বিনোদনকেন্দ্র বলা হয়। এখানে মানুষ সপ্তাহ সপ্তাহ কাটিয়ে দেয়। শীত মৌসুম হওয়ার কারণে খুব কম পর্যটকই এখানে এসেছিল। যার ফলে আমাদের মত মানুষ এখানে নির্বিঘ্নে কিছু সময় অতিবাহিত করতে সক্ষম হই। অন্যথায় ভীড়ের সময় এখানে অশ্লীলতার যেই তুফান সৃষ্টি হয়, সে অবস্থায় এখানে বেশি সময় কাটানো জটিল হয়ে পড়ে।

এখানেই একটি হেলিকপ্টার সার্ভিস রয়েছে। তারা হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়ে থাকে। আমাদের পথপ্রদর্শক আবদুল কাদের পেটেল সাহেব পীড়াপীড়ি করে আমাদেরকে ঐ হেলিকপ্টারেও আরোহন করান। এতে পাইলট ছাড়া চারজনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমরা তিনজনই তাতে আরোহণ করি। এবারই হেলিকপ্টারে প্রথম আরোহণ করি। এটি দাঁড়িয়েই আকাশে উঠে যায় এবং প্রায় দশ মিনিট সময় নায়াগ্রা জলপ্রপাত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উড়তে থাকে। হেলিকপ্টার থেকে নায়াগ্রা নদী, উভয় জলপ্রপাত এবং এর পার্শ্ববর্তী আমেরিকা ও কানাডার সবুজ শ্যামল ভূমিসমূহের দৃশ্য সত্যিই এমন মনমুগ্ধকর ছিল যে, মাটি থেকে এর স্বাদ উপভোগ করা সম্ভব নয়।

যাই হোক, জগতবিখ্যাত এই জলপ্রপাত, যা পৃথিবীর বিস্ময়কর বস্তুসমূহের অন্যতম এবং যার খ্যাতি বাল্যকাল থেকে শুনে আসছিলাম,

আজ তার দৃশ্য দেখে বড় মনোরম লাগছিল। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার বুকেই যখন এত সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করেছেন, তাহলে জান্নাতের দৃশ্যসমূহ কত সুন্দরই না হবে? যার সম্পর্কে সরকারে দোআলম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের এই বাণী নকল করেছেন যে, 'আমি আমার বান্দাদের জন্য এমব সব বস্তু তৈরী করেছি, যেগুলো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানব হৃদয়ে তার কল্পনাও হয়নি।'

আমরা মাগরিব নামায জলপ্রপাতের সম্মুখেই একটি সবুজ ভূমিতে আদায় করি। সূর্যাস্তের পর নিকটবর্তী একটি টাওয়ার থেকে জলপ্রপাতের উপর বিভিন্ন রঙ্গের আলো ফেলা হয়। যার ফলে নদী, জলপ্রপাত এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের দৃশ্য আরো অধিক সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু সেদিন কোন কারণবশত আলো বন্ধ ছিল। আমরা মাগরিবের নামাযের পর সেখান থেকে টরেন্টোর দিকে ফিরতি যাত্রা করি।

পরদিন বেশির ভাগ সময় অবস্থানস্থলেই অতিবাহিত হয়। দুটি বিশেষ বৈঠক হয়। তাতে বিভিন্ন মতাদর্শের লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন হয়।

সাইন্স সেন্টার

১লা রবিউল আউয়াল ১৪০৯ হিজরী বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বারোটা পর্যন্ত অবস্থানস্থলেই সাক্ষাতের ধারা চলতে থাকে। দুপুর বারোটায় আহমাদ দাউদ সাহেব আমাদেরকে টরোন্টোর সাইন্স সেন্টারে নিয়ে যান। এটি সাধারণের জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীর একটি বিশাল কেন্দ্র। বলা হয় যে, এটি সমগ্র বিশ্বের একক কেন্দ্র।

কেন্দ্রটি বিস্তৃত ও প্রশস্ত একটি চারতলা ভবনে অবস্থিত। এর সকল অংশ সারাদিনেও দেখে শেষ করা সম্ভব নয়। আমরা প্রায় চার ঘন্টা সময় এখানে কাটাই। অতি কষ্টে এর অর্ধেকাংশ ভাসা ভাসাভাবে দেখতে পাই। এই কেন্দ্রে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তু কম্পিউটার, যন্ত্র ও চিত্র ব্যবহার করে প্রদর্শন করা হয় এবং তা সবিস্তারে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথম তলায় নয়টি শাখা রয়েছে। একটি শাখা এটম সংক্রান্ত। এতে এটমের আবিষ্কার এবং তার বৈশিষ্ট্যাবলী প্রভৃতি দেখানো হয়। দ্বিতীয় শাখার নাম টেকনোলজি। এতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীর ব্যবহার দেখানো হয়। তৃতীয় শাখা যোগাযোগ সংক্রান্ত। এখানে ভ্রমণের বিভিন্ন মাধ্যম ও উপকরণের বিষয়বস্তু জোগাড় করা হয়েছে। চতুর্থটি বিজ্ঞান প্রদর্শনের। এতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ধ্বনি, আলো ইত্যাদি সৃষ্টি করার বিভিন্ন খেলা দেখানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পঞ্চম শাখা বার্তা প্রেরণ সংক্রান্ত। এতে টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ওয়ারলেস, রেডিও ও টেলিভিশনের মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী দেখানো হয়। ষষ্ঠ শাখা 'জীবন' সংক্রান্ত। এতে জীব–জন্তুর বিভিন্ন ধাপ অণুবীক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়। সপ্তম শাখা সেসব প্রাকৃতিক শক্তির প্রদর্শনী সংক্রান্ত, যেগুলো পৃথিবীতে প্রভাব–প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অষ্টমাংশ কানাডার প্রাকৃতিক উপাত্ত–উপকরণ সম্পর্কে। নবম অংশ খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু নিয়ে।

দ্বিতীয় তলায় মহাকাশ সম্পর্কে মনোমুগ্ধকর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন সমগ্র বিশ্বজগতের একটি মডেল তৈরী করে দেখানো হয়েছে যে, এতে গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি কিভাবে পরিভ্রমণ করে। চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সম্পর্ক স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। সূর্যের আলোতে দিন রাত সৃষ্টির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এমনিভাবে বিভিন্ন গ্রহের নমুনা দেখানো হয়েছে। চাঁদের পরিভ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যের যোগান দেওয়া হয়েছে।

এই তলাতেই একটি অংশ 'মলিকুল' (Molecule) সংক্রান্ত রয়েছে। তাতে বিভিন্ন বস্তুর মলিকুল এবং তার গুণাগুণ দেখানো হয়েছে। একটি অংশে লেজার রশ্মির প্রদর্শন করা হয়। এটি বিশেষ এক ধরনের রশ্মি, যার দ্বারা বর্তমান যুগে অনেক কাজ নেওয়া হচ্ছে। এমনকি এটি অপারেশন করতেও ব্যবহৃত হয়। এই রশ্মি রঙ্গিন বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কিন্তু সাদা রঙহীন বস্তুর উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। এখানে তারা এই দৃশ্য দেখালো যে, একটি রঙ্গিন ধুলির উপর এই রশ্মি ফেললে তা ফেটে গেল, অতঃপর সেই রশ্মিই সাদা ধূলির উপর ফেললে

তা যথাস্থানে নিরাপদে থাকল। তারপর সাদা ধুলির ভিতরে একটি লাল ধুলি রেখে তার উপর রশ্মি ফেলা হল। তখন এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখা গেল যে, ভিতরের লাল ধুলি ফেটে গেল আর বাহিরের সাদা ধুলি পূর্ববৎ অক্ষত রইল।

এই তলাতেই মৃত্তিকা ও তার উপর উৎপন্নশীল বিভিন্ন খাদ্যের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দুইতলা বেশির ভাগই পরিদর্শন ও সমাবেশস্থল এবং অফিস ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত হয়।

এই বিজ্ঞান কেন্দ্রে দীর্ঘ চার ঘন্টা সময় চোখের পলকেই কেটে গেল। এখানে বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বজগতে তাঁর নিপুণ কারিগরী ও অসীম শক্তির মাধ্যমে কত কি বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে বুদ্ধি, চিন্তা, সাহস ও চেষ্টার কত ধরনের শক্তি দান করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে তারা এই বিস্ময়কর বিষয়াবলী আবিস্কার করতে এবং তার ব্যবহারিক পন্থা জানতে পেরেছে। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এই কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত বিশ্বজগতের কোটি অংশের এক অংশও আবিস্কার করতে সক্ষম হয়নি।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

অর্থ ঃ কত মহান সেই সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।

এখান থেকে অবসর হতে হতে আসরের সময় সংকীর্ণ হতে যাচ্ছিল। আমরা এখানেই জামাতের সাথে আসর নামায আদায় করি। সেদিনই আমাকে মন্টারিয়াল অভিমুখে রওয়ানা হতে হবে। তাই অবস্থানস্থলে পৌছার পর অনতিবিলম্বে বিমান বন্দর অভিমুখে যাত্রা করি।

মন্টারিয়াল নগরীতে

রাত আটটায় বিমান মন্টারিয়ালের অভিমুখে যাত্রা করে। এক ঘন্টা সফর করে মন্টারিয়াল পৌছি। মন্টারিয়াল কানাডার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এটি কানাডার দক্ষিণ পূর্ব প্রদেশ কিউবেক (Quebec)এর রাজধানী। শহরের মাঝ বরাবর সেন্ট লার্নস নামে একটি অতি প্রশস্ত নদী প্রবাহিত হয়েছে। এখানে যার প্রস্থ এক মাইল বা তারও অধিক। নদীটি

মন্টারিয়াল নগরীকে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত করেছে। এই নদীর তীরেই কানাডার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বন্দরও অবস্থিত। নদীটি এত বিস্তৃত, প্রশস্ত ও গভীর যে, এতে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে আসা-যাওয়া করে।

কিউবেক প্রদেশের বেশির ভাগ অধিবাসীই ফরাসী। তাই এখানকার সরকারী ভাষাও ফরাসী।

রাত নয়টায় মন্টারিয়াল বিমানবন্দরে যখন আমি অবতরণ করি, তখন সেখানে আমার মেজবান জনাব সামিউল্লাহ সাহেব এবং সেখানকার ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি, জনাব মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেব প্রমুখ স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। জনাব মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেবের বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন ছিল শুক্রবার। ইসলামিক সেন্টারে আমার জুমুআর নামায পড়ানোর প্রোগ্রাম ছিল। তবে আমার ইচ্ছায় মেজবানগণ জুমুআর পূর্বে মেকেগাল বিশ্ববিদ্যালয় দেখানোর প্রোগ্রাম করেন। সুতরাং প্রায় সকাল নয়টায় সামিউল্লাহ সাহেব সেখানে যাওয়ার জন্য আমাকে নিতে আসেন।

মেকেগাল বিশ্ববিদ্যালয়

মন্টারিয়ালে বড় বড় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তার মধ্যে কোনটির ভাষা ইংরেজী এবং কোনটির ভাষা ফরাসী। মেকেগাল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অধমের আগ্রহের কারণ এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামী ষ্টাডিজ বিভাগ' সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ। বর্তমান যুগের অনেক প্রসিদ্ধ মুসতাশিরিক[১] এখান থেকেই ডিগ্রী লাভ করেছে। অনেক মুসলমান পণ্ডিতও এখান থেকে ইসলামীয়াতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে গর্ব অনুভব করে থাকেন। সুতরাং আলমে ইসলামের অনেক আধুনিকমনা লেখক, যারা মুসতাশরিকীনদের ন্যায় চিন্তাধারার অধিকারী তারা এই প্রতিষ্ঠানেরই ফসল।

টীকা-১.মুসতাশরিকীন বলা হয় পাশ্চাত্যের ঐ সকল অমুসলিম ইসলামিক স্কলারকে, যারা ইসলামের সমালোচনা ও তার খুঁত আবিস্কার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচারণ করার মানসে ইসলামিয়্যাত নিয়ে পড়াশোনা করে। —অনুবাদক।

মেকেগাল বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন মন্টারিয়াল শহরের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। জুমুআর আগে এত বেশি সময় ছিল না যে, এখানকার ব্যবস্থাপনা ও পাঠ্যক্রমের বিস্তারিত নিরীক্ষা করা যায়। তাই আমি আগে এখানকার ইসলামী ষ্টাডিজ বিভাগের লাইব্রেরী দেখাকে প্রাধান্য দেই। কারণ, প্রসিদ্ধ আছে যে, এই লাইব্রেরী আমেরিকা মহাদেশে ইসলামী জ্ঞান বিষয়ক সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী।

এতে সন্দেহ নেই যে, এই লাইব্রেরীতে ইসলামী উলূমের গ্রন্থরাজির অতীব মূল্যবান ভাণ্ডার রয়েছে। মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৯০ হাজার। এখানে সারা দুনিয়ার প্রায় ৯শ পত্র–পত্রিকার রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। ৩৩০টি পত্রিকা নিয়মিতভাবে এখানে আসে। ১৬৫টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রয়েছে। হাতে লেখা গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন আল্লামা খেয়ালী (রহঃ) লিখিত 'শরহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যা'। এটি ৮৯৯ হিজরীতে লেখা হয়। মুদ্রিত গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্বপ্রাচীন সেই ষোলটি গ্রন্থ, যেগুলো প্রেস আবিস্কারক ইবরাহীম মুতাফাররিকা অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ইস্তাম্বুলে মুদ্রণ করেছিলেন। তাছাড়া হস্তলিপির প্রাচীনতম একটি নিদর্শন দুআর সংকলনরূপে রয়েছে, যা হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর দিকে সম্পৃক্ত।

গ্রন্থভাণ্ডারের মধ্যে আরবী, ফারসী, উর্দূ, তুর্কি, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মানী ভাষায় ইসলামী উলূমের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ শামিল রয়েছে। এর সঠিক ব্যবস্থাপনা হলে এটি একটি উৎকৃষ্ট কুতুবখানার রূপ নেবে। দূর থেকে আমরা খুব খ্যাতি শুনেছিলাম যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে কুতুবখানাসমূহের বিন্যাস ও শৃংখলা আদর্শমানের হয়ে থাকে। যে কারণে কিতাব খুঁজে বের করতে কোন সমস্যাই হয় না। এই লাইব্রেরীর ব্যাপারেও এমনি ধারণা ছিল। এমন অনেক লোক যারা এখান থেকে শিক্ষা লাভ করেছে এই কুতুবখানার গ্রন্থভাণ্ডার ছাড়াও এর বিন্যাস ও শৃংখলার প্রশংসা করে আসছে। কিন্তু কুতুবখানা দেখার পর আপনা আপনি এই কবিতা মুখে এসে গেল—

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا
جو چیرا تو اک قطرۂ خوں نہ نکلا

অর্থ ঃ পার্শ্বদেশে অন্তরের অনেক হৈ চৈ শুনতাম,
কিন্তু বক্ষ ফাঁড়ার পরে এক ফোটা রক্তও বের হয়নি।

বাস্তব এই যে, কিতাবের তরতীব ও বিন্যাসের দিক থেকে এটি এই পরিমাণ ত্রুটিপূর্ণ ও বিশৃংখল কুতুবখানা যে, এই যুগে গুরুত্বপূর্ণ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বোধহয় এত অধিক বিশৃংখলা কল্পনা করা মুশকিল। আমি যখন প্রথম আলমারীতে বিভিন্ন ইলম ও বিষয়ের তথা জ্ঞান–বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি ওলটপালট দেখতে পাই, তখন আমি মনে করি যে, হয়ত ঘটনাক্রমে এ আলমারীতে এমন হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী আলমারীতেও একই অবস্থা দেখতে পাই। এরপর উপর তলার সকল আলমারী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে শেষ করার পর অনুমান হয় যে, এতে আর সংশয়ের কিছু নেই। ফেকাহর কিতাবের সাথে ইতিহাসের, তাফসীরের সাথে রিজালের (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত গ্রন্থ), হাদীসের সাথে দর্শনের, কালামের (যুক্তি সম্বলিত আকিদা গ্রন্থ) সাথে ভূগোল গ্রন্থ এমন বিশৃংখলভাবে রাখা হয়েছে যে, প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাসের কোন নিরীখেই এর বৈধতা চোখে পড়ে না।

আমি নিচে এসে কুতুবখানার গ্রন্থতালিকার সাহায্যে বিন্যাসের ধরন অনুমান করতে চাইলাম। কিন্তু এখানকার গ্রন্থ তালিকা তিনটি। একটি প্রচলিত কেটালগরূপে, একটি রেজিষ্টাররূপে, আরেকটি কম্পিউটারে। কিছু বইয়ের নাম কেটালগে লিপিবদ্ধ, কিছু রেজিষ্টার বইয়ে আর কিছু কম্পিউটারে। কোন্ ধরনের বই কোথায় তালাশ করতে হবে, তার খোঁজ পাওয়া কঠিন। আমি জানতে চাইলাম যে, ফেকাহর অধীনে কোন্ কোন্ কিতাব রয়েছে, তখন ফেকাহ বা এতদসংক্রান্ত কোন শিরোনাম তিন তালিকার কোথাও পেলাম না। কিতাবের সন্ধানে সহযোগিতার জন্য যে দায়িত্বশীল মহিলা রয়েছে, সে একথাও জানেনা যে, কিতাবের তালিকায় 'ফেকাহর' একটি শিরোনাম থাকা দরকার।

পরিশেষে এই জট খোলার জন্য লাইব্রেরীর প্রধান ব্যবস্থাপকের

নিকট গেলাম। মিঃ এ্যাডাম গাসোক লাইব্রেরীর প্রধান ব্যবস্থাপক। অত্যন্ত ভদ্র ও মিশুক মানুষ। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, ফেকাহর বিষয়টি কম্পিউটারে 'ইসলামিক ল' শিরোনামে রয়েছে। অতঃপর তিনি কম্পিউটারে এটি বের করে দেখালেন। তখন আমি এর অধীনের শিরোনামগুলো দেখে সর্বপ্রথম উপশিরোনাম 'আল ফরুসিয়া' দেখতে পাই। এতে আল্লামা ইবনে কাইয়ুম (রহঃ)এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল ফরুসিয়া' লিপিবদ্ধ ছিল। তখন আমার একথা বুঝে আসছিল না যে, শ্রেণীবিন্যাসকারীগণ ফেকাহর মধ্যে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম আলফরুসিয়া কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করল? আমি মিঃ এ্যাডাম গাসোকের নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তার আল ফারুসিয়া এর অর্থ জানা ছিল না। তাই তিনি উত্তর দিতে আপত্তি জানালেন। পরে আমি তার নিকট কুতুবখানার বিশৃংখলার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি প্রথমে বিভিন্ন ধরনের অসম্পূর্ণ উত্তর দিলেন। কিন্তু অনেক প্রশ্ন করার পর শেষ পর্যন্ত আসল কারণ এই জানতে পারলাম যে, যখন প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ডঃ ওয়ালফেড কেন্টোল স্মিথ এই সংস্থার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন, তখন তিনি কুতুবখানার শ্রেণীবিন্যাসের স্কীমও নিজেই প্রস্তুত করেন। যা প্রচলিত স্কীমসমূহ থেকে ভিন্ন ছিল। এই স্কীম বিষয়ভিত্তিক বা বর্ণক্রমিকের চেয়ে অধিক আলমে ইসলামের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিত্তিতে ছিল। যেমন মিসরে লিখিত গ্রন্থসমূহ এক জায়গায়, সিরিয়ার গুলো আরেক জায়গায়, এভাবে অন্যান্যগুলো বিন্যাস করা হয়েছে।

লাইব্রেরীর পরবর্তী ব্যবস্থাপকগণ এই স্কীম পাল্টিয়ে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের স্কীম অনুযায়ী এর স্কীম তৈরী করার ইচ্ছা করে। কিন্তু বাস্তবে তাও পুরোপুরি অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি। যার ফলাফল প্রকাশ পায় এই বিশৃংখলা।

আমি মিঃ এ্যাডাম গাসোককে বললাম, আমাদের দারুল উলূমের কুতুবখানা যদিও কিতাবের সংখ্যার দিক থেকে আপনাদের অর্ধেকের কাছাকাছি (অর্থাৎ ৯০ হাজারের জায়গায় প্রায় ৫০ হাজার কিতাব), কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ শৃংখলা ও শ্রেণীবিন্যাস এমন যে, কিতাব খুঁজে বের করতে এক আধ মিনিটের বেশি সময় ব্যয় হয় না। প্রত্যেক বিষয়ের

কিতাব যুক্তিযুক্ত ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত আছে।

যাই হোক, কুতুবখানার বিন্যাস যদি ভাল হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে কিতাবের ভাণ্ডারের দিক থেকে এটি একটি উৎকৃষ্ট কুতুবখানা হবে। এখান থেকে সংস্থার ছাত্র শিক্ষকদেরকে কিতাব ধার দেওয়া হয় এবং বাইরের যেসব লোক ফিস দিয়ে সদস্য হয়, তাদেরকেও কিতাব দেওয়া হয়।

কিতাব ধার দেওয়ার জন্য একে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের কিতাব বেশির চে' বেশি দু' সপ্তাহ পর্যন্ত রাখতে পারবে। দ্বিতীয় প্রকারের কিতাব ২ দিনের জন্য নেওয়া হয়। বাকী কিতাব শুধুমাত্র লাইব্রেরীতে পড়া যায়, বাইরে নেওয়া যায় না। নির্ধারিত সময়ে কিতাব ফিরিয়ে না দিলে জরিমানা করা হয়।

কুতুবখানা দেখার পর এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান শাখায়ও যাই। সময়ের স্বল্পতার কারণে সংস্থার বিধি ব্যবস্থা পূর্ণরূপে জানার সময় ছিল না। তবে যেসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র সামনে আসে। এম.এ এবং পি.এইচ.ডি এর শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়বস্তু ছাড়াও আরবী ভাষা ও তার সাথে আলমে ইসলামের অন্য যে কোন একটি ভাষা (যেমন ফারসী, তুর্কি বা উর্দূ ইত্যাদি) পড়াও আবশ্যিক। কিন্তু ফরাসী বা জার্মান বা উভয় ভাষা শেখাও জরুরী। উপরের শ্রেণীসমূহে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—

১. মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস

২. বিংশ শতাব্দীর আরবদের চিন্তাধারা

৩. মুসলিম ভারতের ইতিহাস

৪. ইসলামী ঐতিহ্য, এতে পবিত্র কুরআন, পবিত্র সীরাত, আকাইদ, আমল এবং বিভিন্ন সংস্থার ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত

৫. ইসলামী সভ্যতার আদর্শ যুগের ইতিহাস

৬. ফাতেমীদের ইতিহাস

৭. মধ্যযুগীয় ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস

৮. ইসলামী চিন্তাধারার উত্থানের নিরীক্ষা।

এছাড়া তাফসীরে কুরআন, ইসলামী ফালসাফা (দর্শন), ইসলামী

উসূলে ফেকাহ, তাসাওউফ, শিয়া মতাদর্শ, ইসমাইলী চিন্তাধারা, সাহিত্য, ইরান ও পাকিস্তানে ইসলামের উত্থান, ইসলামের পুনর্জাগরণের আন্দোলনসমূহ, মৌলবাদের আন্দোলন, মুসলিম দেশসমূহে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মত বিষয়বস্তুও বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ বিষয়তো পরিষ্কার যে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ইসলামকে সত্য ধর্ম মনে করে তার হেদায়েত ও তালিমাত তথা শিক্ষা ও নির্দেশনা দ্বারা উপকৃত হওয়া নয়। সুতরাং এখানকার শিক্ষকদের বেশির ভাগই অমুসলিম, যারা নিজেদের গবেষণা ও সন্ধানের বিষয়বস্তু ইসলাম ও মুসলমানকে বানিয়েছে। তারা প্রত্যহ ইসলামী জ্ঞানের সমুদ্রে ডুব দেওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা নিজেদের ঠোঁটকেও সিক্ত করতে পারেনি। সত্য কথা হল, পাশ্চাত্যে ইসলামের উপর 'রিসার্চ'কারী এসব সংস্থার আসল উদ্দেশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করে ইসলাম সম্পর্কে সংশয়ের বীজ বপন করা এবং মুসলিম দেশসমূহে পশ্চিমা স্বার্থ সংরক্ষণকারীদেরকে জ্ঞান অস্ত্রের যোগান দেওয়া। আর খুব বেশি সুধারণা পোষণ করলেও এটিকে একটি জ্ঞান মনে করে তা অর্জন করাই এদের উদ্দেশ্য।

এ থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জ্ঞানকে শুধুমাত্র জ্ঞান হিসেবে অর্জন করা, যা জানা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং তা মেনে চলা বা তার সামনে আত্মসমর্পণ করা থেকে দূরে থাকা হয়, তা মানুষকে কোনরূপ কল্যাণ পৌঁছায় না। এমন জ্ঞান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি রয়েছে ইবলিসের। কিন্তু তা তাকে 'কুফর' ও 'জাহান্নাম' থেকেও বাঁচাতে পারেনি। যেই জ্ঞান মানুষকে তার খালিক ও মালিক আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তাকে ঈমানও লাভ করায় না, তার দেহে প্রভাব সৃষ্টিকারী ডিগ্রীসমূহের যত মনোমুগ্ধকর আবরণই পরানো হোক না কেন, তা জীবন সংগ্রামে মানুষের কোন কাজেই আসে না।

এ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, পবিত্র কুরআনের মত হেদায়াত দানকারী কিতাবও যদি অন্তরে 'সত্যের সন্ধানের' দরদ সৃষ্টি করা ছাড়া পাঠ করা হয়, তাহলে তা মানুষকে হিদায়াত দান করে না। বরং সত্যের

সন্ধানের পরিবর্তে অন্তরে যদি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা থাকে, তাহলে এই কিতাব থেকেই হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা ভাগ্যে জোটে এবং মানুষ তার মঞ্জিলের (গন্তব্যস্থলের) ঠিকানা অর্জন করার পরিবর্তে তার চিন্তাধারা ও আমলের বিপথগামিতায় আরো পোক্ত হয়ে যায়। কুরআনুল কারীম নিজেই বলেছে—

يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের (কুরআন) মাধ্যমে অনেককে গোমরাহ করেন এবং অনেককে হেদায়েত দান করেন।'

মুসতাশরিকীনদের এসব সংস্থার উদ্দেশ্য আর যাই হোক, কিন্তু সত্যের সন্ধান নয়। আর এরই ফলে তারা দিবস রজনী কুরআন ও সুন্নাহ্র গবেষণার কাজে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তার প্রকৃত নূর থেকে বঞ্চিত। বরং বড় শিক্ষার বস্তু এই যে, কুফুরীর অন্ধকার থেকেও তারা মুক্তি লাভ করতে পারেনি।

কিন্তু এর চেয়ে অধিক শিক্ষণীয় বিষয় হল, মুসলিম দেশসমূহের এই চিন্তাধারা যে, এসব কিছু প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তারা ইসলামী উলূমের এসব সংস্থার ডিগ্রীকে নিজেদের সমাজে অতি উঁচু স্থান দিয়ে রেখেছে এবং মুসলমানদেরকেও বাধ্য করে রেখেছে যে, যদি সরকারীভাবে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে নিজের যোগ্যতা স্বীকৃত করাতে চাও তাহলে ঐ সব সংস্থা থেকে শিক্ষা লাভ করে আস এবং তাদের মাপমাঠিতে যোগ্য প্রমাণিত হও, যারা এসব ইসলামী ইলম দ্বারা ঈমান ও আমলে সালেহের সম্পদ লাভ করতে চায় না। এ যেন একথা বলা যে, ইসলামেও সেই ইলমই গ্রহণযোগ্য, যাকে ইসলামের সত্যতাকে অস্বীকারকারী এই অমুসলিমরা সঠিক সাব্যস্ত করবে। চিন্তার দাসত্ব এবং আত্মমর্যাদার দেউলিয়াপনার এটি চূড়ান্ত পর্যায়, যা আজ অনেক মুসলিম দেশে একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ভিত্তিতেই দ্বীন এবং দ্বীনী ইলমের দক্ষতা ও যোগ্যতাকে পরখ করা হচ্ছে। তাদেরকে একথা বলার কেউ নেই—

کرمکِ ناداں! طوافِ شمع سے آزاد ہو
اپنی ہستی کے تجلّی زار میں آباد ہو

অর্থ ঃ নির্বোধ পতঙ্গ প্রদীপকে প্রদক্ষিণ করা থেকে মুক্ত হও !
আপন অস্তিত্বের আলোকমালায় উদ্ভাসিত হও !

যাই হোক, মুসতাশরিকীন আন্দোলন, তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোকপাত এক স্বতন্ত্র বিষয়, যার বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা এই সফরনামাকে ভারি করা যাবে না। তবে এ কয়েকটি কথা এমন ছিল, যা এ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় আমার মন মগজকেও আচ্ছন্ন করে রাখে।

জুমুআর নামাযের সময় নিকটবর্তী। এখান থেকে আমরা মন্টারিয়ালের কেন্দ্রীয় মসজিদ 'মসজিদ আল ইসলাম'–এ পৌছি। এটি ইসলামিক সেন্টার নামে প্রসিদ্ধ। এখানে আমি প্রথমে উর্দূতে দশ মিনিট বক্তব্য রাখি। তারপর এরই সারকথা আরবী খুৎবায় পেশ করি। নামাযান্তে মারকায পরিদর্শন করি। মাশাআল্লাহ বড় সুন্দর এই মসজিদ। এর সাথে তালীম ও তাবলীগ অর্থাৎ শিক্ষাদান ও ইসলাম প্রচারণামূলক কাজের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও রয়েছে। মারকাযের ব্যবস্থাপনা ভারত উপমহাদেশ এবং আরব দেশসমূহের মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করে থাকেন।

সেদিন মাগরিবের নামাযের পর ওয়েষ্ট আইল্যাণ্ডের একটি মসজিদেও দীর্ঘ বক্তৃতা হয়। নারীরা পর্দা সহকারে সেখানে উপস্থিত ছিল। বক্তব্য শেষে দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নোত্তরের ধারা চালু থাকে। পরদিন সকাল দশটায় অধমের অবস্থানস্থল অর্থাৎ জনাব মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেবের বাড়িতেই প্রশ্নোত্তরের একটি বৈঠক ছিল। তাতে বিভিন্ন মতাদর্শের বিরাট সংখ্যক লোক খুব আন্তরিকতা নিয়ে অংশগ্রহণ করে এবং সেদিনের দুপুর বারোটা পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে।

মা'হাদ আর রশীদ আল ইসলামী

বারোটার সময় আমরা মন্টারিয়াল থেকে প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ দূরের

কর্নওয়াল (Cornwall)এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এখানে মা'হাদ আর রশীদ আল ইসলামী নামে একটি দ্বীনী মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসাটি দেখা এবং সেখানকার লোকদের সাথে সাক্ষাত করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় দেড় ঘন্টা সময় সফর করার পর আমরা কর্নওয়াল পৌছি। মাদ্রাসাটি একটি নদীর তীরে বড় মনোরম স্থানে অবস্থিত। মাশাআল্লাহ! মাদ্রাসাটি বিস্তর জায়গা পেয়েছে। এটি খুবই সস্তামূল্যে কেনা একটি বিরাট ভবন। যা পূর্বে হাসপাতাল ভবন ছিল।

মাদ্রাসার মুহতামিম (অধ্যক্ষ) মাওলানা মাযহার আলম সাহেব সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব (কুঃ সিঃ)এর মনের একান্ত বাসনা ছিল যে, কোন আলেমে দ্বীন আমেরিকা মহাদেশকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে সেখানে দ্বীনের তালীম ও তাবলীগের দায়িত্ব সম্পাদন করুক এবং সেখানে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুক, যেটি এ অঞ্চলের প্রয়োজন মাফিক শুধু শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থাই নয়, বরং ক্রমান্বয়ে এমন আলেম তৈরী করবে, যারা আমেরিকায় মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজন পুরা করতে সক্ষম হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি মাওলানা মাযহার আলম সাহেবকে মনোনীত করেন এবং তাকে কানাডা প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। মাওলানা যখন কানাডা এসে পৌছেন, তখন তার এ এলাকা সম্পর্কে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। তিনি ইংরেজী ভাষাও জানতেন না। ফলে প্রথমদিকে বড় ত্যাগ তিতীক্ষার সাথে সময় অতিবাহিত করেন। এমনকি কয়েকদিন পর্যন্ত বিমান বন্দরেই ক্ষুৎপিপাসাসহ পড়ে থাকেন। পরিশেষে হযরত শাইখুল হাদীস সাহেব (কুঃ সিঃ)এর মনের বাসনা এবং মাওলানার কোরবানী ফলদায়ক হয়। আল্লাহ পাক গায়েব থেকে সাহায্য করেন। ধীরে ধীরে এই বিশাল মাদ্রাসা অস্তিত্ব লাভ করে। মাওলানা এখানে আসার পরেই ইংরেজী শিক্ষা করেন। এখন তিনি নির্বিঘ্নে ইংরেজীতে ভাষণ দান করেন। তিনি এই মাদ্রাসাকে এই পর্যায়ে উপনীত করতে অত্যন্ত অসাধারণ সাহস, দৃঢ়তা ও শ্রম দান করেছেন।

এখন মাশাআল্লাহ এখানে কানাডা এবং আমেরিকার বিভিন্ন

অঞ্চলের অনেক শিশু অবস্থান করছে। স্থানীয় শিশুরাও শিক্ষা লাভ করছে। এখনও যেহেতু সূচনাপর্বই চলছে, তাই বর্তমানে পবিত্র কুরআনের হিফয ও নাজেরা এবং প্রাথমিক দ্বীনিয়াতের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সমকালীন প্রচলিত শিক্ষাও সাথে সাথে চলছে। মাদ্রাসার সনদপত্র সরকারীভাবে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত। এই শিশুরা শিক্ষায় যতই সামনে অগ্রসর হবে, ততই ইসলামী উলূমের (জ্ঞান বিজ্ঞানের) উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাও হবে ইনশাআল্লাহ।

মাদ্রাসাটি যাকে হযরত শাইখুল হাদীস (কুঃ সিঃ)এর কারামতই বলা চলে, দেখে মন আনন্দে ভরে যায়। কারণ, মাশাআল্লাহ! এ অঞ্চলে মুসলমানদের দ্বীন সংরক্ষণের এটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা মাদ্রাসাটিকে জাহেরী ও বাতেনী (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ) উন্নতি দান করুন এবং দ্বীনের বেশি বেশি খিদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দুপুরের খাবার মাওলানা মাযহার আলম সাহেবের এখানে খাই। অত্যন্ত মহব্বতের সাথে তিনি মাদ্রাসাটি দেখান এবং তার বিভিন্ন কাজের পরিচয় তুলে ধরেন। আসর নামায মাদ্রাসাতেই আদায় করে মন্টারিয়ালের উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করি।

মাগরিব নামাযের পর মন্টারিয়ালের শহরতলীর সাউথ শোর গ্রামের মসজিদে আমার ভাষণ দানের প্রোগ্রাম ছিল। এশার পর এখানকার একজন ধার্মিক ব্যবসায়ী জনাব আহমাদ শায়েখ সাহেবের বাড়ীতে খাবার খাওয়া হয়। তারপর প্রশ্নোত্তর বৈঠক চলে। রাত দশটার পর বৈঠক শেষ হয়।

ফেরার পথে অধমের মেজবান জনাব মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেব সারাদিনের ক্লান্তির পর বিনোদনের উদ্দেশ্যে মন্টারিয়াল শহর হয়ে এখানকার প্রসিদ্ধ পাহাড় মোন্ট লার্নস এ নিয়ে যান। এটি অত্যন্ত সুন্দর ও সবুজ শ্যামল পাহাড়। এর পাদদেশে মন্টারিয়াল শহর পুরোটা আবাদ রয়েছে। মন্টারিয়াল মূলত মোন্ট লার্নস এরই বিকৃত রূপ হওয়া বিস্ময়ের কিছু নয়। পাহাড়ের শিখর হতে পুরো শহরের দৃশ্য বড়

মনোরম দেখা যায়। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত আলোকরাজির ধারাবাহিকতা দেখা যায়। সেন্ট লার্নস এর পানিতে আলোর প্রতিবিম্ব প্রবাহিত স্বর্ণের দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। কবি বুহতারী একটি পুকুরের এমনই এক দৃশ্য দেখে এই কবিতা রচনা করেন—

إذا النجوم ترائت فى جوانبها

ليلا، حسبت سماء ركبت فيها

অর্থ ঃ নিশিকালে যখন নক্ষত্ররাজি তার বিভিন্ন কোণায় পরিদৃষ্ট হয়, তখন মনে হয় যেন আকাশ তার মধ্যে লেপ্টে আছে।

অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম

পরদিন ছিল রবিবার। পশ্চিমা দেশের মানুষের সচরাচর নিয়ম এই যে, এদিন যোহর পর্যন্ত তারা যার যার বাড়ীতে অবস্থান করে। কোন সমাবেশ বা উৎসব থাকলে তা যোহরের পর হয়ে থাকে। সেখানে মানুষ গুরুত্বসহকারে অংশগ্রহণ করে থাকে। সুতরাং আজ যোহর নামাযের পর ইসলামিক সেন্টারে অধমের দীর্ঘ বক্তব্যের প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। যোহরের আগ পর্যন্ত অবসর ছিল। অধমের মেজবান জনাব সামীউল্লাহ সাহেব প্রায় দশটার সময় আমাকে নিতে আসেন এবং মধ্যবর্তী সময়টিতে মন্টারিয়ালের প্রসিদ্ধ অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম দেখাতে নিয়ে যান। কয়েক বছর পূর্বে এখানে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ষ্টেডিয়াম ও তার সংলগ্ন ভবনসমূহ সে সময় নির্মিত হয়েছিল। নির্মাণ শিল্পের দিক থেকে ভবনগুলো ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যাবলীর ধারক হওয়ায় এখন এটি একটি বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

জায়গাটি মন্টারিয়াল নগরীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দিক থেকে মন্টারিয়ালের সর্বাধিক সুন্দর অঞ্চল। এখানে আগে থেকে একটি বিস্তীর্ণ পার্ক ছিল। কিন্তু ১৯৭৬ ঈসায়ীতে যখন এই জায়গাটি অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য মনোনীত করা হয়, তখন প্রায় বারো কোটি ডলার ব্যয়ে এখানকার ষ্টেডিয়ামে এই ভবন নির্মাণ করা হয়। যা বিশ্বের অদ্বিতীয় ষ্টেডিয়াম ভবন। ষ্টেডিয়ামটি সেতারের

আকৃতিতে বানানো হয়েছে। এর পেট মূল গ্রাউণ্ড। তার উপর পেয়ালার আকৃতির একটি ফোল্ডিং ছাদ রয়েছে। এটি যখন ইচ্ছা উপর থেকে সরানো যায়। উপরে ছাদ থাকলে একটি অতি বিস্তৃত হলকক্ষ আর ছাদ উঠিয়ে নেওয়া হলে একটি মাঠের রূপ নেয়। ফোল্ডিং ছাদের আয়তন ২ লক্ষ বর্গফুট। সব মিলিয়ে এটি একশ' নব্বই টন ওজনের ছাদের কিনারে সেতারের মাস্তুলের আকৃতিতে ৫৫৬ ফুট উঁচু একটি টাওয়ার। টাওয়ারটি ৫০ তলা ভবনের সমান। একেবারে উপরে তার লাগানোর কোণ ৪৫ ডিগ্রী। টাওয়ার থেকে ষ্টেবলের শক্ত রশি ষ্টেডিয়ামের ছাদের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে, যেগুলো একদিকে ঝুকে পড়া টাওয়ারের সমতা ঠিক রাখে। অপরদিকে এগুলো ছাদ উপরে উঠানোর কাজেও ব্যবহৃত হয়। এভাবে দৈত্যাকৃতির এই ছাদ পঁয়তাল্লিশ মিনিটে উপরে উঠে যায়। সেতার সদৃশ ভবনের মাস্তুলরূপে ব্যবহৃত এই টাওয়ার বিশ্বের সর্বোচ্চ বাঁকা টাওয়ার। উপর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য এতে একটি ক্যাবল কেবিন লাগানো হয়েছে। ক্যাবল কেবিনটি দ্বিতল বিশিষ্ট। এটি বাঁকা বিন্দু থেকে উপরে ওঠা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ পথ সোজা থাকে। এতে একত্রে নব্বই জন উপরে উঠতে পারে। দুই মিনিটে উপরে পৌছে যায়। উপরে ওঠার পথে এর কাঁচের দেওয়ালের মাধ্যমে আশেপাশের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

ভবনটি নিঃসন্দেহে নির্মাণ শিল্পের এক রাজকর্ম। বিভিন্ন দিক থেকে এটি অতি বিস্ময়কর একটি ভবন। কিন্তু কোটি কোটি ডলারের এই বিরাট অংক এবং হাজার হাজার মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তি যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দেখলে এটি মানুষের জন্য একটি চিন্তার ক্ষেত্র প্রমাণিত হয়। ক্রীড়া, শারীরিক ব্যায়াম ও বিনোদন মানুষের জন্য অবসর সময়ের একটি কাজ হতে পারে,কিন্তু যেভাবে একে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে তার পিছনে দেহ, মন ও সম্পদ ব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলছে, হতদরিদ্রতায় নিমজ্জিত এই বিশ্বে এর পেছনে যেভাবে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে, বিবেক, বুদ্ধি এবং ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে কি এর কোন বৈধতা রয়েছে? কিন্তু 'উন্নত' (?) এই যুগে এ জাতীয় চিন্তা ও পুরাতন ও রক্ষণশীলতার প্রতীক হয়ে গেছে। তাই কে এই পুরাতন কথায় কান দিবে?

যোহরের কিছু পূর্বে আমরা ইসলামিক সেন্টারে পৌঁছি। যোহরের নামাযের পর প্রায় দেড় ঘন্টা বক্তৃতা চলে। নারী ও পুরুষের বেশ বড় সমাবেশ হয়। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরের দীর্ঘ বৈঠক হয়।

আমার স্নেহভাজন জনাব শামীম সাহেব মন্টারিয়ালেই বাস করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তার ওখানে যাওয়া হয়নি। এখান থেকে তার বাড়ীতে যাই। অনেক বন্ধু–বান্ধবও সেখানে যায়। অবশেষে বিমান বন্দরে যাওয়ার সময় হয়ে যায়। মাগরিব নামায আমি বিমানবন্দরে আদায় করি। নামাযের পর টরেন্টোর পথে যাত্রা করি।

টরেন্টোতে পরদিন ইসনার সভাপতি জনাব আশরাফ সাহেব এবং হাউজিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব পারভেজ নাসীম সাহেবের সঙ্গে হাউজিংএর স্কীম সম্পর্কে শরীঅতের সঠিক পন্থা নিয়ে আলোচনা করার জন্য সন্ধ্যার সময় নির্ধারিত ছিল। কিন্তু অবিরাম সফরের কারণে এখনো পর্যন্ত আমি স্কীমের বিস্তারিত দিকসমূহ যথাযথভাবে অধ্যয়ন করে আমার প্রস্তাবাবলী বিন্যস্ত করতে পারিনি। সুতরাং আমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্কীম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং এর বিকল্প প্রস্তাবসমূহ প্রস্তুত করার কাজে সময় অতিবাহিত করি। এর মাঝে মাঝে বিভিন্ন লোকও সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতে থাকে। আসর পর আমরা ইসনার অফিসে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হই। মাগরিবের নামাযও সেখানেই আদায় করি। রাতের খাবার সেখানেই খাওয়া হয়। স্কীমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাত এগারোটা পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে। পারভেজ নাসীম সাহেব স্কীমের বিস্তারিত দিকসমূহ এবং আমার প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে বাস্তব সমস্যা তুলে ধরেন। আলহামদুলিল্লাহ, পরিশেষে আমার প্রস্তাবের সাথে তারা ঐক্যমত পোষণ করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা তাদের কর্মপন্থা সংশোধন করার জন্য এ বিষয়ে বোর্ডের মঞ্জুরী অর্জন করবেন। তারপর এসব পরিবর্তনের আলোকে তাদের চুক্তিসমূহ নতুনভাবে বিন্যস্ত করে করাচীতে আমার নিকট পাঠাবেন।

পরদিন ছিল মঙ্গলবার। সকালবেলা কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করার প্রোগ্রাম ছিল। আমার এখানে অবস্থানকালে এই প্রথম বাজারে গেলাম। এটন সেন্টার (Eaton Centre) এখানকার বিরাট বড় সুপার

মার্কেট। মার্কেটটি কয়েক তলায় বিস্তৃত। এটি নিজেও এক দর্শনীয় স্থান।

টরেন্টো আসা–যাওয়া করতে প্রায় প্রতিদিনই জগৎ বিখ্যাত সি.এন.এন. টাওয়ার চোখে পড়ত। এটি বর্তমান সময়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার। আমার বন্ধুরা সেখানেও নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম করেছিলেন। তাঁরা আমাকে এটন সেন্টার থেকে সেখানে নিয়ে যান। টাওয়ারটি ৩৩৮·৫৩৩ মিটার (১৮১৫ ফুট ৫ ইঞ্চি) উঁচু। এর উচ্চতা প্রায় ১৮১ তলার সমান। উপরের অংশে দূরদর্শনের যন্ত্রপাতি বসানো আছে এবং ১৪৬৫ ফুট উঁচুতে সর্বোচ্চ তামাশাক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু ঝঞ্চা বিক্ষুব্ধ বাতাসের কারণে ঐ তলা আজকে বন্ধ ছিল। এর নীচে ১১৩৬ ফুট উঁচুতে ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁ রয়েছে। কাঁচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে এখান থেকে শহরের দৃশ্য দেখা যায়। সম্মুখের একদিকে কানাডার সর্ববৃহৎ ঝিল অন্টারিভ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। অন্যান্য দিকে টরেন্টো ও তার শহরতলী অঞ্চল ছড়িয়ে আছে। নীচে সড়কের উপরের ধাবমান গাড়িসমূহ ও সারিবদ্ধ অগ্রসরমান মানুষ পিপীলিকাসম দৃষ্টিগোচর হয়। এ সময় আমার শ্রদ্ধেয় পিতার সেই কথা স্মরণ হল যে, যখন মাত্র এতটুকু উঁচুতে উঠে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ দেখা যায়, তাহলে যেই সত্তা [হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সপ্তাকাশ এবং তারও উপরের জান্নাত–জাহান্নাম দেখে এসেছেন, তিনি দুনিয়াকে মশার পাখা থেকেও তুচ্ছ বললে এতে আশ্চর্যের কি আছে?

সেদিনই মাগরিব নামাযের পর বন্ধু জনাব নাঈম সাহেবের বাড়ীতে এক সমাবেশ ছিল। তারা টরেন্টোর বিভিন্ন এলাকায় দরসে কুরআন ইত্যাদির বৈঠক করে থাকেন। সেখানে অধমের বক্তৃতা হয় এবং অনেক রাত পর্যন্ত এখানকার তাবলীগ ও দাওয়াত বিষয়ে মতবিনিময় হতে থাকে।

ওদিকে আমেরিকার প্রসিদ্ধ শহর শিকাগো থেকে মাওলানা কারী আবদুল্লাহ সেলিম সাহেবের বার বার ফোন আসতে থাকে। তিনি চাচ্ছিলেন যে, কয়েকদিনের জন্য আমি শিকাগোতে যাই। সুতরাং ৭ই রবিউল আওয়াল বুধবার (১৯শে অক্টোবর) থেকে ১০ই রবিউল আওয়াল শনিবার পর্যন্ত তিন দিনের জন্য শিকাগো ভ্রমণের সিদ্ধান্ত হয়।

শিকাগো নগরীতে

পরদিন সকাল সাতটায় বিমান বন্দরের দিকে রওয়ানা হই। বেলা দশটায় আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বিমান যাত্রা করে। এখানে সব জায়গাতেই বিমান বন্দরের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সহজ ও সরল। প্রাচ্যের দেশসমূহের মত বিমান বন্দরে অনেক ধৈর্য সংকুল ধাপসমূহ অতিক্রম করতে হয় না। বরং প্রায় একই কাউন্টারে বেশির ভাগ ধাপ পার হয়ে যায়। বিশেষ করে এই সুবিধাটি এখানে প্রথমবার দেখতে পাই যে, যেই ইমিগ্রেশন এবং কাষ্টমসের কাজ আমেরিকায় পৌছে হওয়ার কথা ছিল, তা টরেন্টোর বিমান বন্দরেই হয়ে যায়। আমরা যখন বিমানে সওয়ার হই, তখন সকল ঝামেলা থেকে এমনভাবে মুক্ত ছিলাম, যেন নিজ দেশের বিমানে ভ্রমণ করছি।

বিমানটি দেড় ঘন্টা উড়ার পর শিকাগোর বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এটি বিশ্বের ব্যস্ততম বিমান বন্দরসমূহের অন্যতম। এখানে রানওয়ের দিগন্তে প্রায়ই আট দশটি বিমান চিলের সারির ন্যায় মাটিতে অবতরণে প্রস্তুত দেখা যায়।

বিমান বন্দরে মাওলানা কারী আবদুল্লাহ সেলিম সাহেব স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। করাচীর মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের মাওলানা ইয়াকুব বাওয়া ও মাওলানা মঞ্জুর হোসেন সাহেবও সে সময় শিকাগোতে ছিলেন। তারাও বিমান বন্দরে এসেছিলেন। মাওলানা কারী আবদুল্লাহ সেলিম সাহেবের বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী সাহেবের (মুঃ যিঃ) নিকটাত্মীয় এবং অধমের চাচাত ভাই মাওলানা খুরশীদ আলম সাহেবের (দেওবন্দ) শ্যালক। তিনি কয়েক বছর যাবৎ শিকাগোতে বসবাস করছেন। মাশাআল্লাহ! তিনি এখানে তালীম ও তাবলীগের অতীব উন্নত ধারা চালু করেছেন। এসব অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য কোন আলেমে দ্বীনের অস্তিত্ব বিরাট বড় নেআমত। মাশাআল্লাহ! মাওলানা এখানে অনেক উৎকৃষ্ট কাজ সম্পাদন করছেন।

তিনি মাগরিব পর তার বাড়ীতে শিকাগোর ইসলামী সেন্টারসমূহের নির্বাচিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত করেছিলেন। তাদের মধ্যে

থেকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের নাম আমার বিশেষভাবে মনে আছে। সুদানের মহামান্য আলেম শায়েখ মুহাম্মাদ নূর মালেকী। তিনি এখানের একটি মসজিদ ফাউণ্ডেশনের সভাপতি। তার কথাবার্তা থেকে অনুমান হয় যে, মাশাআল্লাহ! তিনি একজন যোগ্য আলেম। তিনি এতদঅঞ্চলে অতীব মূল্যবান দ্বীনী খেদমত সম্পাদন করে যাচ্ছেন।

ডঃ আহমাদ সাকার, মূলত তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। তবে দ্বীনের সাথে তার গভীর সম্পর্কের কারণে অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছেন। পাশ্চাত্যে যেসব খাদ্য ও ঔষধ সচরাচর ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর উপাদান সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে তিনি এসব উপাদানের হালাল হারাম হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং মুসলমানদেরকে কোন্ কোন্ খাদ্য পরিহার করতে হবে সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। গ্রন্থটি আমেরিকার মুসলমানদের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে।

এম.সি.সি (মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার) এখানকার মুসলমানদের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান। এর অধীনে মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল্ বেশির ভাগই উপমহাদেশের মুসলমান। অনেক আরবও এতে শরীক রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ফখরুদ্দীন সাহেবের সাথেও এই সমাবেশে সাক্ষাত হয়।

জনাব আবেদুল্লাহ আনসারী সাহেব, যিনি হযরত মাওলানা হামেদ আল আনছারী গাজী সাহেবের পুত্র। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মক্কায় বসবাস করছেন। তিনি ইকরা ফাউণ্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন। এর অধীনে তিনি বাচ্চাদেরকে দ্বীনী তালিম (ধর্মীয় শিক্ষা) দেওয়ার জন্য সহজ ইংরেজী পাঠ্য–পুস্তক তৈরী করেছেন। সেগুলো অত্যন্ত সহজ, সরল এবং প্রচলিত শিক্ষার ধারা মোতাবেক রচিত। এছাড়াও তিনি ইংরেজীতে একাডেমিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহ সংকলন করার ও প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখেন। কিছুদিন তিনি জেদ্দাতেও থেকেছেন। জেদ্দাতেও তার নিকট থেকে এই পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা শুনেছিলাম।

জনাব আবদুল কাবী সাহেব, তিনি এম.সি.সি. এর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান। আমেরিকান মুসলমানদের সমস্যাবলী সম্পর্কে তিনি গভীর আন্তরিকতা সহকারে ভাবেন।

এছাড়াও শিকাগো ও তার উপকণ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাবশালী বিরাট সংখ্যক মুসলমানের সাথে সেই নৈশভোজে সাক্ষাত হয়। এখানকার সমস্যাবলী সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে পারি। অনেক রাত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর সহযোগিতার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। পরদিন বৃহস্পতিবার এশার নামাযের পর মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের হলকক্ষে নৈশভোজ ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। সেদিন দিনের বেলা অবসর ছিল। আমার ফিরতি পথে প্যারিসে অবতরণের জন্য ফ্রান্সের ভিসা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। সুতরাং জনাব মাওলানা আবদুল্লাহ সেলীম সাহেব আমাকে ফ্রান্সের অফিসে নিয়ে যান। অফিসটি শহরের মাঝখানে অবস্থিত। এখান থেকে ফ্রান্সের ভিসা সংগ্রহ করি।

এখান থেকে কিছুদূরে শিকাগোর জগৎবিখ্যাত ভবন সিয়ার্স টাওয়ার (Sears Building) অবস্থিত। মাওলানা এই অধমকে সেখানেও নিয়ে যান। সিয়ার্স টাওয়ার বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন। প্রথমে নিউইয়র্কের ১০২ তলা বিশিষ্ট এম্পেয়ার ষ্টেট বিল্ডিংকে বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন মনে করা হত। তার পর নিউইয়র্কেরই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মিত হয়। এটি ১১০ তলা বিশিষ্ট। কিন্তু এখন শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার ১১৫ তলা বিশিষ্ট। এটি উক্ত ভবনদ্বয় থেকেও উপরে চলে গেছে। এই ভবন ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৪৫৪ ফুট উঁচু। যদিও টরেন্টোর সি.এন টাওয়ার এর চেয়েও অধিক উঁচু, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে তফাৎ এই যে, সি.এন টাওয়ার একটি টাওয়ার মাত্র। পক্ষান্তরে, সিয়ার্স টাওয়ার নিয়মতান্ত্রিক একটি ভবন। এর প্রত্যেক তলা বিভিন্ন অফিস ইত্যাদিতে ব্যস্ত। তাই সি.এন টাওয়ার বিশ্বের উচ্চতম মিনার হলে এটি বিশ্বের উচ্চতম ভবন। গ্রাউণ্ড ফ্লোর থেকে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অতি দ্রুতগামী একটি লিফট ব্যবহার করা হয়। লিফটটি পঞ্চাশ সেকেণ্ডে ১০৩ তলায় পৌঁছে যায়। এখানে একটি তামাশাকেন্দ্র রয়েছে। এর চতুর্দিকে কাঁচের দেওয়ালের সাথে

অনেকগুলো দূরবীন বসানো আছে। এখান থেকে শিকাগোর পুরো শহর ও তার পশ্চাতের মিসিগান ঝিল দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়।

সেদিন এশার নামায মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারে আদায় করি। নামাযের পর এম.সি.সি'র পক্ষ থেকে সংবর্ধনামূলক নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে শহরের বিভিন্ন এলাকার এবং বিভিন্ন দলের প্রায় ১০০ জন মুসলমানকে দাওয়াত করা হয়। নৈশভোজের পর এম.সি.সি'র চেয়ারম্যান জনাব ফখরুদ্দীন সাহেবের পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ দেওয়া হয়। তারপর অধমের ভাষণ হয়। পরিশেষে দীর্ঘ সময় প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলতে থাকে।

পরদিন ছিল জুমুআবার। জুমুআর নামাযও কমিউনিটি সেন্টারের মসজিদেই আদায় করি। নামাযের পূর্বে কয়েক মিনিট বক্তব্য রাখি। তারপর আরবী খুৎবাতে তারই সারাংশ তুলে ধরি। কারণ এখানে হাজিরীনদের মধ্যে আরব লোকও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে।

শিকাগোতে জর্দানের একজন আলেম শায়েখ আলাউদ্দিন খারুফাও বসবাস করেন। গত রাতের নৈশভোজে তার সাথে মোলাকাত হয়েছিল। তিনি জুমুআর পর তার বাড়ীতে খানা খাওয়ার দাওয়াত করেছিলেন। তিনিও জুমুআর নামাযে এসেছিলেন। নামাযান্তে তার সঙ্গে তার বাড়ীতে যাই। শায়েখ খারুফা অত্যন্ত সৎচরিত্রবান, মেধাবী, চতুর ও মিশুক আলেম। তার সঙ্গে এখানকার উদ্ভূত ফেকাহ সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে দীর্ঘ সময় কথা হয়। আসর নামাযও তার সাথেই পড়ি। এখান থেকে শহরের একেবারে বিপরীত দিক যেতে হবে। সেখানে মাগরিব পর সীরাতে তাইয়্যেবা বিষয়ে অধমের বক্তৃতার ঘোষণা হয়েছিল। এ সমাবেশ শহরের অন্য একটি সংস্থা 'মুসলিম ফাউণ্ডেশনের' ব্যবস্থাধীনে হচ্ছিল। এই সংস্থার অধীনেও একটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা এবং মুসলমানদের অন্যান্য সমাজসেবা ও দাওয়াতী কর্মসূচীর ব্যবস্থা রয়েছে। মাওলানা আবদুল্লাহ সেলীম সাহেব এই সংস্থাতেই দরসে কুরআনের ধারা চালু করেছেন। মাশাআল্লাহ। এখানে তা অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

এখানেও নারী–পুরুষ উভয়ের জন্য পৃথক সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় দেড় ঘন্টা বক্তব্য হয়। পরে প্রশ্নোত্তর ধারাও চলতে

থাকে। এশার নামাযও এখানেই আদায় করি। তারপর অবস্থানস্থলে ফিরে যাই।

পরের দিন ভোর পাঁচটাতেই টরেন্টো পৌঁছতে হবে। মাওলানা আবদুল্লাহ সেলীম সাহেব বিমান বন্দরে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে বিদায় জানান। দেড়ঘন্টার সফর শেষে টরেন্টো পৌঁছি। আজ বিকেলে করাচীর পথে যাত্রা করতে হবে। বেরাদারে মুহতারাম জনাব মুহাম্মাদ ওলী রাযী সাহেবের এক বন্ধু জনাব ফরিদ সাহেব পূর্বেই আমার থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, এ দিনটি তার ওখানে অবস্থান করব। তিনি আগে থেকেই বিমান বন্দরে এসেছিলেন। আমাকে সাথে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। টরেন্টোর অন্যান্য বন্ধুরাও সেখানে যান।

বিকাল চারটায় বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এখানে বিদায় জানানোর জন্য অনেক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত ডঃ মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব, আল মদীনা মসজিদের মাওলানা খলীল সাহেব, মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব, আমাদের মেজবান জনাব আবদুল হাই পেটেল সাহেব, মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াতের হাফেজ সাহেব এবং টরেন্টোর আরো অনেক বন্ধু–বান্ধব উপস্থিত ছিলেন।

টরেন্টোর বন্ধুরা কমপক্ষে আরো এক সপ্তাহ কানাডায় থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। এদিকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং আমেরিকার আরো কয়েকটি রাজ্য থেকেও সেসব জায়গায় কিছুদিন থাকার জন্য ফোন আসছিল। কিন্তু অধম এই সফরের জন্য যে তিন সপ্তাহ নির্ধারণ করেছিলাম, তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। করাচীতে জরুরী কাজও ছিল। যেজন্য তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার ছিল, বিধায় ওজর পেশ করা ছাড়া উপায় ছিল না। এখানকার বন্ধুরা যেই মুহাব্বত ও এখলাসপূর্ণ আচরণ করেছেন, তার চিত্র অন্তরে বহন করে সন্ধ্যা সাতটায় প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

প্যারিসে শেষ দিন

টরেন্টো থেকে প্যারিস পৌঁছতে প্রায় আট ঘন্টা আকাশে উড়তে হয়। উভয় দেশের সময়ের পার্থক্য ৫ ঘন্টা। তাই স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে নয়টায় প্যারিসে পৌঁছি। প্যারিসের এক ব্যবসায়ী বন্ধু সাঈদ সাহেব বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যান। দুই রাত বিনিদ্র কাটানোর পর বিশ্রামের জন্য কয়েকটি ঘন্টা বিরাট বড় নেআমত মনে হয়। যোহর পর্যন্ত আরাম করার পর খাবার খাই। অতঃপর সাঈদ সাহেব শহরের কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার এবং তারপর বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম করেন।

প্যারিস তার রূপলীলা ও কমনীয়তার জন্য সমগ্র পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। এতে সন্দেহ নেই যে, এটি অত্যন্ত সবুজ শ্যামল এবং প্রাকৃতিক ও নগরায়নিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ একটি শহর। এর ভবনসমূহে প্রাচীনতা ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। দ্রব্যমূল্য খুব বেশি হওয়া সত্ত্বেও এখনও শহরটি পর্যটনের বিরাট বড় একটি কেন্দ্র। এখানকার মূল এলাকা সাঞ্জালিজে বিশ্বের সুন্দরতম বাজারসমূহের অন্যতম। বিস্তৃতি, পরিচ্ছন্নতা, ভবনসমূহের ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্য ও মনোহরী বৃক্ষরাজির দুধারী সারিসমূহের দিক থেকে সত্যিই এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী অঞ্চল। একে বিনোদনের জন্যও অতি উপযুক্ত স্থান মনে করা হয়। কিন্তু পশ্চিমা দেশসমূহের এ জাতীয় স্থানগুলো অন্যায় অপকর্মেরও সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। যার কালিমা আমাদের মত অন্ধ আত্মাও অনুভব না করে পারে না।

সাঞ্জালিজের সড়ক সেই চৌরাস্তায় গিয়ে শেষ হয়েছে, যার সম্মুখে ফ্রান্স পার্লামেন্টের বিশাল ভবন অবস্থিত। ঐ চৌরাস্তায় ফ্রান্স বিপ্লবের সময় বাদশাহকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

চৌরাস্তার ডানদিকে যুগ বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার অবস্থিত। এটি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভবন বলে গণ্য হত। পরবর্তীতে নিউইয়র্কে এর চেয়েও উঁচু ভবনসমূহ নির্মাণ করা হলে তার এই মর্যাদা লোপ পেয়ে যায়। তবে সৌন্দর্য ও গঠনশৈলীর জন্য এখনও একে দুনিয়ার সুন্দরতম ভবনসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়। আজও এটি পর্যটনের বড় একটি কেন্দ্র। ৯৮৪ ফুট উঁচু এই টাওয়ারের পুরোটাই লোহার তৈরী।

টাওয়ারটি ফ্রান্স বিপ্লবের স্মৃতিরূপে নির্মাণ করা হয়। ফ্রান্স সরকার যখন ১৮৮৯ ঈসায়ীতে বিপ্লবের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন সারা দেশের প্রকৌশলীদের নিকট হতে স্মৃতিসৌধের নমুনা চেয়ে এর উপর একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১০০টি নকশা সামনে আসে। কিন্তু পরিশেষে সংশ্লিষ্ট কমিটি বিখ্যাত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আলেকজাণ্ডা গুস্তাভ আইফেল (Gustav Eiffel)এর নকশা মঞ্জুর করেন এবং তারই নামে এর নাম আইফেল টাওয়ার রাখা হয়।

পুরো টাওয়ারটি লোহার তেরী। টাওয়ারের খুঁটিসমূহ অতি বিস্তৃত, প্রশস্ত ও উঁচু। খুঁটিসমূহকে চারটি মেহরাবের আকৃতিতে পরস্পর সংযুক্ত করা হয়েছে। তারপর টাওয়ারটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। বর্তমানে এতে একটি লিফটও যুক্ত করা হয়েছে। একে সব সময় টাওয়ারের মাঝে কোথাও না কোথাও নড়তে দেখা যায়। বলা হয় যে, লোহার সুন্দর এই ফ্রেমটি মাত্র কয়েকমাসে তৈরী করা হয়। এতে শ্রম ও অর্থ উভয়টিই বিশ্বের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্মৃতি সৌধের তুলনায় অনেক কম ব্যয় করা হয়েছে।

আইফেল টাওয়ারের নীচে ও তার আশেপাশে খুব সুন্দর একটি পার্ক রয়েছে। অদূরেই সীন নদী প্রবাহিত। নদীটি প্যারিসকে দুই অংশে বিভক্ত করেছে। উভয় অংশকে সংযুক্ত করার জন্য জায়গায় জায়গায় খুব সুন্দর পুল নির্মাণ করা হয়েছে।

বিমান বন্দর যাওয়ার পথেই সাঈদ সাহেব এসব অঞ্চল দেখান। আইফেল টাওয়ারের নীচের একটি পার্কে আমরা আসর নামায আদায় করি। তারপর বিমান বন্দরের দিকে রওয়ানা হই।

আমি মাগরিব নামায বিমান বন্দরে আদায় করি। রাত নয়টায় এয়ার ফ্রান্সের বিমান করাচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সাত ঘন্টা উড়ার পর বিমান যখন করাচী অবতরণ করে, তখন সকাল ১০টা। স্বদেশের মধুরতা দেশের বাইরে কিছুদিন অতিবাহিত করেই যথাযথ অনুধাবন করা যায়। চাকচিক্যময় পাশ্চাত্য দেশসমূহের দীর্ঘ সফরের পর নিজের সাদামাটা এবং দৃশ্যত রংহীন এই পরিবেশ এত হৃদয়গ্রাহী ও প্রিয় মনে হচ্ছিল যে,

এর তুলনায় উন্নত দেশসমূহের জাঁকজমক তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। যখন আরব উপসাগর থেকে পূর্ব দিকের স্থলের চিহ্ন এবং তার উপর করাচীর অবিন্যস্ত বসতি বিক্ষিপ্তরূপে দেখা দেয়, তখন হৃদয়ে ও নয়নে পুলক ও ভালবাসার বিস্ময়কর ঝর্ণাসমূহ উৎসারিত হতে থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর থেকে এই দোয়া বের হতে থাকে—

اَللّٰهُمَّ أَعْطِ أَرْضَنَا زِينَتَهَا وَسَكَنَهَا وَ بَرَكَتَهَا وَلَاتَحْرِمْنَا بَرَكَةَ مَا أَعْطَيْتَنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের দেশকে শোভা, তৃপ্তি ও বরকত দান কর এবং আমাদেরকে প্রদত্ত বস্তুসমূহের বরকত থেকে বঞ্চিত করো না। ইয়া আর হামার রাহিমীন।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ পর্যন্ত আমি চার বার সফর করেছি। তার মধ্যে দু' বারই আমেরিকা মহাদেশে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের জীবনধারা ও তার ভাল–মন্দ দিকসমূহ সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া আমেরিকার প্রথম সফরনামায় লিপিবদ্ধ করেছি।

সমাপ্ত

MAKTABATUL-ASHRAF

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪